চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায়
বিপ্লব থেকে বিশ্বায়ন [তৃতীয় অংশ] পৃষ্ঠা ৩

বিশ্বায়িত চীনে রাষ্ট্রের ভূমিকা,
শ্রম–নীতি এবং গ্রাম থেকে শহরে আসা
অভিবাসী শ্রমিকদের সংগ্রাম পৃষ্ঠা ১৭

মাওবাদ–মাও চিন্তাধারা — কিছু কথা পৃষ্ঠা ২২

প্রতিবেদন :

নির্দলীয়তা থেকে ক্ষমতা–মুক্তি প্রবাহে পৃষ্ঠা ২৮
পাঠকসভার বিবরণ পৃষ্ঠা ৩০

চিঠিপত্র :

১. বিষয় : হিংসা–অহিংসার তর্ক পৃষ্ঠা ৩২
২. বিষয় : বাতিল শ্রমিক পৃষ্ঠা ৩৪

মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা
এক দর্জির কথা পৃষ্ঠা ২

সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ২০১০ ❒ একাদশ বর্ষ ❒ পঞ্চম সংখ্যা ❒ ১০ টাকা

মন্থন
সাময়িকী

চীনের আকাশে ...

এবছর জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকেই আমরা চীন নিয়ে কিছু আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। দ্বিতীয় দফায় মে–জুন সংখ্যার পর বর্তমান সংখ্যায় ফের আমরা চীনের আলোচনায় ঢুকছি। কেন এখন আমরা চীন নিয়ে আলোচনা করছি, তা এর আগে আমরা বলার চেষ্টা করেছি। এবারের সংখ্যায় এসেছে ১৯৮০–পরবর্তী চীনের আলোচনা।

একসময় বামপন্থী রাজনীতিতে একটা জোরালো তর্ক ছিল, ভারতীয় সমাজ–অর্থনীতির সঙ্গে কার বেশি মিল, চীন না রাশিয়ার? যার সঙ্গে মিল, সেই দেশের বিপ্লবের পথ ও পন্থা অনুসরণ করা যাবে। সমাজ পরিবর্তনের কাজটা সহজ হয়ে যাবে। সেই তর্কটা একসময় পড়ে থাকা এক থালা মুড়ির মতো মিইয়ে গেল। আজও তার জের রয়েছে 'মার্ক্সবাদী' না 'মাওবাদী' এই টানাপোড়েনের মধ্যে।

আসলে একটা সময় পর্যন্ত চীন সম্পর্কে জানতে বুঝতে হলে দুটো সূত্র প্রবল হয়ে দেখা দিত : চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আর পশ্চিমি সাহিত্য। এ দুটোই ছিল প্রবল প্রোপাগান্ডিস্ট, প্রচারপ্রিয়। মাও সেতুঙের লেখায় উঁকিঝুঁকি মারত এক 'হান শভিনিজম'–এর বিপদের কথা। কিন্তু সেসব লেখাপত্রে তার দৌরাত্ম টের পাওয়া যেত না। পরে যখন পুব আর পশ্চিম একাকার হয়ে যেতে লাগল; যখন তিব্বত, পূর্ব তুর্কিস্তান, শিনজিয়াং–এ বিক্ষোভের কথা জানা গেল; যখন ২০০৮ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে তিব্বতীরা পথে নেমে পড়ল, তখন আমরা জানবার বুঝবার আরও সূত্রের দিকে চোখ ফেরাতে শুরু করলাম। মন্থন পত্রিকার পরিসরে আমাদের চর্চার সেটাই সূচনা।

যে পশ্চিমি বুদ্ধিজীবীরা একসময় 'চীনের আকাশে লালতারা' দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, এখন কি 'চীনের আকাশে [এশিয়ান গেমসের] ভেলকি'–র আলোয় তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল? নাকি সেই প্রবল আলোর নিচে নিকষ অন্ধকারেও তাঁরা চোখ রাখতে চাইছেন? চীন নিয়ে আমাদের চর্চা সেই প্রশ্নটাও তুলতে চাইছে।

মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা এক দর্জির কথা

রুমানা মাখদুমি

অনুবাদক : অমিতাভ সেন

সে ছিল এক গরিব দর্জি, বাঁচার জন্য তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হত। পাঁচ মেয়ের বাবা, এই মানুষটার শান্ত স্বভাব আর বিনীত আচরণ আপনাকে মুগ্ধ করবে। আমার বাপের বাড়ির পিছনে একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে সে সেলাইয়ের কাজ করত। নিজের কাজটা সে বেশ ভালোভাবেই করত। প্রায় শূন্য হাতে সে শুরু করেছিল। সেই অবস্থা থেকে এক ভালো দর্জি হিসেবে তার দাঁড়িয়ে যাওয়া দেখে আমরা ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। এবছর রমজান মাসে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। সেদিনটা ছিল সাধারণ দিনগুলোর থেকে আলাদা, 'সব স্বাভাবিক' ছিল। সে দোকান খুলেছিল। আমি যখন একব্যাগ কাপড় সেলাই করার জন্য তার হাতে তুলে দিলাম, তাকে দেখে একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। সে আমাকে কথা দিল, ঈদের আগেই পোশাকগুলো সে সেলাই করে দেবে। আমিও তাকে সেলাইয়ের খরচ দিয়ে দিলাম। আমি জানতাম তার চিন্তার কারণ কী, সম্ভবত চারদিকে যা ঝামেলা চলছিল তা তাকে সমস্যায় ফেলেছিল — সে ঠিকমতো দোকান খুলতে পারছিল না আর কাজের অভাবে তার রোজগার তলানিতে ঠেকেছিল। তার বড়ো পরিবারে অনেকগুলো সদস্যের খাবার জোটাতে হত। কিন্তু উপত্যকার অশান্ত পরিবেশ সাধারণ মানুষকে বাধ্য করছিল কোনরকমে দিন কাটাতে। ওই সমস্যাদীর্ণ সময়ে জামাকাপড় সেলাই করতে দেওয়া সাধারণ মানুষের কাছে বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে অবশ্য তার কথা রেখেছিল। ঈদের আগেই সে আমার পোশাকগুলো সেলাই করে দিল। কিন্তু আমি যখন সেগুলো আনতে গেলাম, তখন আগের মতোই তার শঙ্কিত চাহনি ও ফ্যাকাসে মুখ দেখে আমার খুব কষ্ট লাগল। আমি তাকে সাহায্য করতে চাইতাম। কিন্তু সে হাত পেতে সাহায্য নিতে ইতঃস্তত করত। আমি অবশ্য তার এই মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকাটাকে পছন্দ করতাম। কোন কোন সময় সে মাথাটাকে একটু বেশি উঁচু করে থাকত, যাতে আমাদের সাহায্যের অনুরোধে তা নুয়ে না পড়ে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করতাম, "আল্লা যেন তোমায় সবসময় মাথা উঁচু করে থাকতে সাহায্য করে।"

ঈদের পরবর্তী সময়টায় উপত্যকা উত্তাল হয়ে উঠল। সরকার কড়া কার্ফুর নির্দেশ জারি করল, জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পঙ্গু হয়ে গেল, তারা ঘরের মধ্যে আটকে রইল। এমনকী ভবঘুরে কুকুরগুলোও রাস্তায় ঘুরতে ভয় পেতে লাগল। এই কবরের নীরবতার মধ্যে আমি হঠাৎ একটা ফোন পেলাম — আমার মা ফুঁপিয়ে কাঁদছে — 'ওই দর্জিভাই মারা গেছে'। আমি যা শুনলাম তা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিছুদিন আগেও তাকে দেখেছিলাম, ভালোই তো মনে হয়েছিল। হঠাৎ কী হল, আমি ভাবতে লাগলাম। কিছুদিন বাদে আমি ওই দর্জির বাড়িতে গেলাম। দর্জির তরুণী বউ আর পাঁচ মেয়েকে দেখেই আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। আমি ওদের সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। ওরা এখন কী করে বাঁচবে, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওদের পরিবারে আর কোন পুরুষ সদস্য নেই, মেয়েগুলোর কেউ চাকরি করে না, কেউ কোন হাতের কাজও শেখেনি, তারা শুধু লেখাপড়া শিখছিল — তাদেরকে নিয়ে তাদের বাবার অনেক বড়ো স্বপ্ন ছিল।

কিন্তু এখন কেন আমি এই দর্জির কথা বলছি? হাজার হাজার মানুষ তো তাদের পরিবারগুলোকে এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় রেখে নানা অসুখে ভুগে মারা যায়। তবু কেন এই দর্জির কথা আমি বলছি, তা আপনাদের ভাবতেই হবে।

এই দর্জির মৃত্যুর কারণ হল — তাকে খুন করা হয়েছে। আপনারাই বিচার করে দেখুন কারা এই দর্জিকে হত্যা করেছে। আমি শুনেছি তার পেটের ডানদিকে ব্যথা হয়েছিল। সে কাছাকাছি এক হাসপাতালে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সেখানে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরেরদিন তার আবার পেটে ব্যথা শুরু হয়। কিন্তু সেদিন হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সে কোন গাড়ি পেল না। তার ব্যথা এত তীব্র ছিল, সে হেঁটে হাসপাতালে যেতে পারল না, ব্যথার বড়ি খেয়ে ঘরে শুয়ে থাকতে বাধ্য হল। কারণ কার্ফুর কড়াকড়ি ছিল ভীষণ রকম। কোন অ্যাম্বুলেন্স বা হাসপাতালে যাওয়ার জন্য কোন গাড়িকেও চলতে দেওয়া হচ্ছিল না। তার অসুখ বেড়ে গেল, অ্যাপেনডিক্স ফুলে উঠে ফেটে গেল এবং তার পৌষ্টিক নালীতে ইনফেকশন ছড়িয়ে গেল। ইনফেকশনের বিষে সে অবসন্ন হয়ে পড়লে তাকে প্রতিবেশীরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অপারেশন করা হয়, সে মারা যায়। তার পাঁচ মেয়ে বাবার কফিন কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে কবর দেয়।

কোন বুলেট এই দর্জির শরীর ফুঁড়ে দেয়নি, কোন বিস্ফোরকের টুকরো ছুটে এসে তাকে আঘাত করেনি, কোন অত্যাচারির চাবুক তার দেহে আছড়ে পড়েনি। তবু সে মারা গেছে, অসহায়, এমন এক অসুখে যে অসুখ সহজে সারানো যায়। তাকে কেউ 'শহিদ' বলবে না, কোন সরকারি সংস্থা তাকে ক্ষতিপূরণ দেবে না। এই গ্রীষ্মে উপত্যকায় যে ১১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের তালিকায় তার নাম নেই। এই নিরপরাধ মানুষটাকে হত্যা করার দায় কে নেবে? এই দর্জির উপযুক্ত স্থান তাহলে কোথায়? কোন তালিকায়? দর্জির বউ আর পাঁচটা মেয়ের ভাগ্যে কী আছে? কেউ কি এই মৃত্যুর দায় ঘাড় পেতে নেবে? সেই উন্নতশির দর্জি এখনও মাটির নিচে শুয়ে আছে, আমি তার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারি না। আমি যা করতে পারি, তা হল ন্যায়বিচারের কাছে আবেদন। আমি কি তা পাব — পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের কাছে?

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হ'ন।

২০১১ সালের ছ'টি সংখ্যার গ্রাহকচাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, ডাক : বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

বিপ্লব থেকে বিশ্বায়ন [তৃতীয় অংশ]

অনিতা চ্যান, রিচার্ড ম্যাডসেন এবং জোনাথন আঙ্গার–এর বই 'চেন ভিলেজ : রেভলিউশন টু গ্লোবালাইজেশন' থেকে চেন গ্রামের বৃত্তান্তের তৃতীয় অংশ এখানে পেশ করা হল। লেখকেরা দক্ষিণ চীনের একটি গ্রামে কয়েকটি পর্যায়ে ১৯৭৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়েছেন। গ্রামের প্রকৃত নামটি তাঁরা গোপন রেখেছেন। প্রথম পর্যায়ে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত তাঁরা ওই গ্রাম থেকে হঙকঙে আসা ২৬ জন অভিবাসীকে সমীক্ষা করেন। পরে ১৯৮৮ থেকে ২০০৭–এর মধ্যে তাঁরা সরাসরি ওই গ্রামে গিয়ে সরেজমিন সমীক্ষা চালাতে সক্ষম হন। প্রথম অংশে ১৯৪৯ সালের বিপ্লব থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও পরবর্তী সময়ের বিবরণ পেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি শেষ হয়েছিল ১৯৭০–এর দশকের গোড়ায়। এবারে তৃতীয় অংশে থাকছে চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায় চীনের অর্থনীতির নতুন যুগের বিবরণ, যখন তা হয়ে উঠল এক গ্লোবালাইজড ওয়ার্কশপ। প্রসঙ্গত, ১৯৬০–এর দশকের গোড়া থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দক্ষিণ চীনের এই গ্রামসমাজে অসাধারণ অদলবদল ঘটে গেছে। সমগ্র চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অদলবদলের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে, চেন গ্রামের বর্ণনায় তা স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এই সমীক্ষালব্ধ বৃত্তান্ত এক কৌমসমাজের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে আমাদের এমন এক 'মানবিক মাপকাঠি' জুগিয়ে দেয়, যা চীনের সুদূরপ্রসারিত পরিবর্তনকে জরিপ করতে সাহায্য করে। সর্বোপরি এই সরেজমিন বর্ণনা প্রচলিত র‍্যাডিকাল বামপন্থী বিপ্লবী তাত্ত্বিক কাঠামোটিকেও সার্বিকভাবে বিচার করতে কিছুটা সাহায্য করে। এটি ইংরেজি থেকে সম্পাদনা ও সংক্ষেপ করে বাংলায় তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী। পরবর্তী সংখ্যায় শেষ অংশে থাকবে আজ পর্যন্ত চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায় চীনের বর্তমান পর্বের খুঁটিনাটি।

অর্থনীতির নতুন যুগ

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় কৃষি–উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল দ্বিগুণ। ব্রিগেড–নেতারা নতুন আয়টাকে কাজে লাগিয়ে কিছু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা করল। ১৯৬৮ সালের আগে চেন গ্রামে কিছু ছোটো ইটভাটা ছিল। প্রথম বড়ো প্রকল্প ছিল একটা ইট কারখানা। এর পরিচালনার কাজে লৌসুন–কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নদীর পার বরাবর মাটি ছিল বেশ উন্নত মানের আর পাহাড়ের চারপাশে ঘন ঘাস ও লতা থেকে সস্তায় জ্বালানি পাওয়া যেত। এতদিন ব্রিগেডের হাতে কোন পুঁজি ছিল না। উৎপাদন টিমেরও পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ১৯৬৮–তে লঙইয়ঙ যখন সব ক'টা টিমের প্রধানদের ডেকে প্রকল্পটা নিয়ে আলোচনা করল, সকলেই তাতে রাজি হয়ে গেল। প্রত্যেক টিম সমান পুঁজির অংশ দিল এবং প্ল্যান্ট তৈরির জন্য পারিশ্রমিক ছাড়াই শ্রমদান করল। ব্রিগেডের মালিকানায় ইট কারখানা, অতএব এর লভ্যাংশও প্রত্যেক টিম পাবে। প্রত্যেক টিম থেকেই সম সংখ্যক সদস্যকে কারখানায় খাটতে পাঠানো হল। বোঝাপড়া হল, ব্রিগেড নিজের হাতে যে অতিরিক্ত লভ্যাংশ রাখবে, তা ভবিষ্যতে ব্রিগেডের পরিষেবার জন্য তহবিলে টিমগুলির দেয় অর্থের চাপ লাঘব করবে।

ইট কারখানার প্রকল্পটি সফল হল। কারখানাটি বেড়ে উঠল এবং ছাদের টালি বানানোও শুরু হল। স্বল্পকালের মধ্যেই এতে ৩০ জনের বেশি পূর্ণসময়ের শ্রমিক নিয়োগ করা হল। এর মুনাফা থেকে বিদ্যুৎ চালিত চালকলের জন্য দোতলা বাড়ি বানানো হল; চিনাবাদাম থেকে তেল প্রস্তুত করার প্ল্যান্টও তৈরি হল। সত্তরের দশকের গোড়ায় গ্রাম থেকে কমিউন বাজার–শহরে যাতায়াতের রাস্তাও উন্নত করা হল, যাতে ট্রাক চলতে পারে। এর ফলে চেন গ্রাম শহুরে শিল্পের জন্য আধা–প্রক্রিয়াজাত কৃষি উৎপন্ন যোগান দেওয়ার ক্ষেত্র হয়ে উঠল। ১৯৭১–এ ব্রিগেড চিনি শোধনাগারকে প্রসার ঘটিয়ে চিনির বর্জিত অংশ থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল তৈরির ব্যবস্থা করল। একটা ছোটো কারখানায় উড–ইয়াম পিষে পাউডার তৈরি করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টার্চ হিসেবে বিক্রির ব্যবস্থা করা হল।

ইতিমধ্যে বাড়তি আয় থেকে চাষের মেকানাইজেশনও শুরু হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে একটা ১৭ হর্সপাওয়ারের ট্রাক্টর কেনা হয়েছিল। এতে বলদ দিয়ে হাল দেওয়ার চেয়ে অনেক ভালো কাজ হত। শীতকালে শক্ত মাটিতে চালাতে গিয়ে এটা বারবার ভেঙে যাচ্ছিল। তখন ট্রাক্টরটাকে ইট ও শস্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার টানাগাড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হল। চার বছর অপেক্ষা করে ১৯৭৩ সালে ব্রিগেড একটা ৪০ হর্সপাওয়ারের 'ইস্ট ইজ রেড' ব্র্যান্ডের ট্রাক্টর কিনতে পারল। সেটাতেও তেমন কাজ হল না এবং তা শেষে পরিবহণের কাজেই লাগল। চাষিরা এতেই খুশি ছিল। কারণ বোঝা ঘাড়ে টানার মাজাভাঙা কষ্ট এতে কিছুটা লাঘব হল।

গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতি পদক্ষেপেই আরও নতুন উদ্ভাবন ও বিনিয়োগের প্রয়োজন তৈরি হচ্ছিল। ট্রাক্টর, জলের পাম্প, কারখানার মেশিনপত্র, শস্য মাড়াইকল, টানাগাড়ি ইত্যাদি নতুন যন্ত্রপাতি সারানোর জন্য ১৯৭২ সালে গ্রামে একটা রিপেয়ারশপ গড়া হল এবং সেখানে ৮ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হল। গ্রামে ঢোকার মুখেই ছিল এই কলকারখানাগুলি। সেগুলি ছিল গ্রামের গর্ব এবং তার পিছনে কিছু পরিবার পাকাবাড়ি বানিয়েছিল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি গ্রামের প্রায় এক–চতুর্থাংশই ছিল এই নতুন ধরনের বাড়ি। মাটির বদলে ইট–সিমেন্টের ব্যবহার বেড়ে উঠল। পালিত মুরগি–শুয়োর আর ঘরের সামনে ঘুরে বেড়াত না। তাদের জন্যও আলাদা ঘর বানানো হল। গ্রামের কাদা আর পশুর বিষ্ঠা ভরা পথও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। ইলেকট্রিক পাম্পে ডিপ টিউবঅয়েল দিয়ে জল তুলে পান ও স্নান করার অভ্যাস গড়ে উঠল চেনদের মধ্যে।

চাষের লাভ থেকে একটা দোতলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল ১৯৭০ সালেই। এখানে দুই নগ্নপদ চিকিৎসকের থাকার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া সামনের ছোটো খোলা জমিতে চীনা ওষধি লতাগুল্ম চাষ করা হয়েছিল। এই নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি উন্নততর খাদ্য, নিকাশি ও পরিচ্ছন্নতার ফলে গ্রামে অসুস্থতা অনেকখানি কমে গিয়েছিল। সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে চেন গ্রামে একজন শিশুও মারা যায়নি। যদিও মেয়েদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য গর্ভপাত প্রায়শই হত।

১৯৬৬ সালে গ্রামের তিন ঘরের স্কুলে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর ওপরে পড়তে হলে এক মাইল হেঁটে অবস্থাপন্ন গ্রামে যেতে হত। ১৯৭০ সালের মধ্যে গ্রামে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ১০ জন শিক্ষক ৩০০ ছাত্রছাত্রীকে সেখানে পড়াত। তখন গ্রামের ৮০–৯০% বাচ্চা স্কুলে যেত।

এই উন্নয়নের সাফল্যের মাথায় পালক লাগাতে লঙইয়ঙ জেলার অন্যদের চেয়ে বড়ো একটা সভাকক্ষ বানাতে চাইল। ইট আর ছাদের টালি হাতের নাগালে থাকায় তিনতলার সমান উঁচু এক সুদৃশ্য হল তৈরি করা হল। এখানে পুরো গ্রামের লোক বসতে পারত।

এরপর গ্রামে বেড়ে উঠল ভোগ্যপণ্যের চাহিদা। ১৯৬৪ সালে চেন গ্রামে একটা আধা–বেসরকারি আংশিক সময়ের জেনারেল স্টোর ছিল। সেসময় সারা গ্রামে একটা মাত্র সাইকেল ছিল। ১৯৭০–এর দশকের মাঝামাঝি সেখানে অর্ধেক পরিবারের হাতে কমপক্ষে একটা করে সাইকেল এল। ১৯৬৪–তে গ্রামে একটা মাত্র রেডিও ছিল — ১নং উৎপাদন টিমের সাধারণ সম্পত্তি। সত্তরের মাঝামাঝি চার থেকে পাঁচ ডজন ব্যক্তিগত রেডিও সেট গ্রামে হল। ১৯৬৪ সালে গ্রামের একমাত্র ঘড়ি ছিল উপ–পার্টি

সম্পাদক ফেইহানের হাতে, সত্তরের মাঝামাঝি প্রত্যেক টিমে কয়েক ডজন ঘড়ি ছিল। আগে গ্রামে একটাও সেলাই মেশিন ছিল না; পরে এক-একটা টিমে এক ডজন করে সেলাই মেশিন হল। এইসব জিনিসগুলোর দাম ছিল ১০০ ইউয়ানের ওপর। সেখানে একজন সমর্থ চাষির যৌথচাষ থেকে রোজগার দৈনিক ১ ইউয়ানের থেকে বেশি ছিল না। তাসত্ত্বেও গ্রামে যা জিনিসপত্র পাওয়া যেত, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক পরিবারের হাতে অর্থের জোগান ছিল। কারণ বহু পরিবারের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বেড়ে উঠছিল। ইট কারখানায় যে গাদাগাদা জ্বালানি লাগত, তাতে এক পাউন্ড ঘাসের দর উঠেছিল ১ ইউয়ান। একজন উদ্যমী মহিলা কয়েক ঘন্টায় সেই ঘাস কেটে ফেলত। সাইকেলের চাহিদাও বেড়েছিল। কারণ একজন চাষি পাহাড়ের জমি থেকে ঘরে ফেরার সময় সাইকেলে কয়েক'শ পাউন্ড ঘাস নিয়ে ফিরতে পারত। কিন্তু চেন গ্রামের জন্য বছরে দু'ডজন সাইকেলই বরাদ্দ ছিল। যদি কোন ক্যাডারের পরিবারে সাইকেল না থাকত, তবে সেই পরিবার অফিসিয়াল কাজের প্রয়োজনে অগ্রাধিকার পেত। বাকিদের ভাগ্য বাৎসরিক লটারির ওপর নির্ভর করত।

গ্রামের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও তখনও প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবার খেটে যে ওয়ার্কপয়েন্ট আয় করত, তাতে রেশনের শস্যের পুরো দাম মেটাতে পারত না। টিমের কাছ থেকে সস্তায় কেজি প্রতি ০.১৯৬ ইউয়ান দরে রেশনের শস্য কিনতে হত। ভালো চাষের বছরে প্রত্যেক শ্রমজীবী পুরুষ পেত মাসে ৩০ কিলো, একজন মহিলা ২৫ কিলো, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণেরা ১৭-২০ কিলো এবং বয়স অনুযায়ী শিশুরা ১০-১৫ কিলো। যারা দাম মেটাতে পারত না — পরিবারে বাচ্চা বেশি, বয়স্ক চাষি ছেলেপুলে নেই, শারীরিকভাবে দুর্বল, অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী — তাদের টিমের কাছে ঋণ থেকে যেত। টিমের কাছে দেনাগ্রস্ত থাকায় তাদের হাতে কোন পয়সা থাকত না। অবস্থাপন্নরা মাঝেমধ্যে ভোগ্যপণ্য কেনাকাটা করলেও শহরের তুলনায় চেন গ্রামে তখনও ছিল কষ্টসহিষ্ণু জীবন। গ্রামের প্রায় সকলেই খালিপায়ে ঘুরত। সত্তরের মাঝামাঝি সাইকেলের টায়ার কেটে চপ্পল বানিয়ে পড়ার রেওয়াজ এল। তবে এক দশক আগেও চেনদের যে অপুষ্টিতে ভোগা নিদারুণ দারিদ্র্য ছিল, সেখান থেকে তারা অনেকটা সরে এসেছিল। এখন শহরের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে পেয়ে তাদেরও বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বাড়তে থাকল।

সুদৃঢ় ব্রিগেড ক্ষমতা এবং নতুন কর্মোদ্যোগ

ষাটের দশকের মাঝামাঝি পাহাড়ের আশপাশে লঙইয়ঙ অস্থায়ী কাজের দল তৈরি করে বেশ কিছু ফলের বাগান করেছিল; এই কাজে যুবকদের লাগানো হত এবং তাদের আলাদা পারিশ্রমিক দেওয়া হত। কিন্তু অচিরেই এই অস্থায়ী ব্যবস্থা আর চলল না। ১৯৬৯-এ ব্রিগেডের দ্রুত বেড়ে ওঠা ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিষেবা ও পার্শ্ব-উদ্যোগগুলোর জন্য আলাদা ব্রিগেড কর্মোদ্যোগ টিম তৈরি করা হল। তার জন্য আলাদা টিম-প্রধান ও একদল ফোরম্যান নিযুক্ত করা হল। কয়েক বছরের মধ্যে এই নতুন টিমের লোকবল দাঁড়াল প্রায় একশ পূর্ণসময়ের কর্মী, গ্রামের মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ। চাষের বীজ বোনা এবং ফসল কাটার সময় এদের অস্থায়ীভাবে পুরনো উৎপাদন টিমের কাজে পাঠানো হত। কিছু পাহাড়ের জমিতে যেতে ঘন্টা দুয়েক সময় লাগত; কিন্তু কি বর্ষা কি রোদ, ঘরের কাছেই অনায়াসে এই কারখানা ও পরিষেবার কাজে যাওয়া যেত। চাষের কাজের চেয়ে এইসব কাজে রোজগারও বেশি হত। ব্রিগেডের আলাদা এই টিমে কোন পুরুষ বা মহিলা চাষের কাজের সমান ওয়ার্কপয়েন্ট অর্জন করতে পারত। একজন সবল পুরুষ যদি এখানে দশ পয়েন্ট পেত, তাহলে তার প্রতি ওয়ার্কপয়েন্টের মূল্য ছিল সবচেয়ে ধনী তিনটি উৎপাদন টিমের পয়েন্টের গড় মূল্যের সমান। ফলে চাষিরা এই কাজে যুক্ত হতে চাইত এবং সেখানে স্বজনপোষণ ও বিবাদ আটকাতে নিয়ম তৈরি করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত পুরনো কারখানা শ্রমিকেরা যে উৎপাদন টিমের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিল, তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করত এবং টিমের সভায় এসে পরামর্শও দিত। কিন্তু অবিবাহিত অপেক্ষাকৃত যুবক ব্রিগেড কর্মীরা নিজেদের একটা নতুন স্বার্থের আলাদা গোষ্ঠীর বলে মনে করত। ব্রিগেডের কর্মসূচির সঙ্গে উৎপাদন টিমের কোন সংঘাত হলে তারা কেউ কেউ ব্রিগেডেরই পক্ষ নিত।

এইভাবে ব্রিগেডের একটা আলাদা ক্ষমতা গড়ে উঠল, যার নিজস্ব আর্থিক শক্তিও তৈরি হয়েছিল। সে আর টিমগুলির দেয় অর্থের ওপর নির্ভরশীল রইল না, তার আরও বেশি বেশি কর্তৃত্ব গড়ে উঠল। এই ক্ষমতা থেকেই লঙইয়ঙ অনেকটা লাভবান হল। শ্রেণী সাধারণের শোধন কর্মসূচির সময়ই তার রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়ে উঠেছিল। ব্রিগেডের আর্থিক স্বাধীনতা এবং গ্রামের সমৃদ্ধি তার সম্মান আরও বাড়িয়ে দিল। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা ওকে সবচেয়ে অপছন্দ করত, তারাও বিরস মুখে স্বীকার করে নিয়েছিল, লঙইয়ঙ ছিল এক পটু অর্থনৈতিক পরিচালক এবং গ্রামের শিল্পায়নের প্রধান কাণ্ডারী। সে অন্য ব্রিগেড ও কমিউন সফর করে সেখানকার আর্থিক উদ্যোগগুলি দেখে এসে চেন গ্রামে সেগুলোর সম্ভাবনা হিসেব করত; গ্রামে ফিরে এসে ব্রিগেড কমিটির কাছে নতুন পরিকল্পনা পেশ করত। এছাড়া মেশিনপত্র, স্পেয়ার পার্টস, নির্মাণ সামগ্রী এবং কাঁচামাল আলাদা ঘুরপথে জোগাড় করার ক্ষমতাও তার ছিল। কিছু নতুন প্রকল্পের জন্য অনেক সময় রাষ্ট্রীয় বরাদ্দের অপেক্ষায় থাকতে হত। তাই সে বেসরকারি লেনদেনের ব্যবস্থা করেছিল। স্টকি ওয়াঙ পরে বলেছিল, "ক্যান্টনের যখন কাঠের দরকার,আমাদের দরকার ইস্পাত, দু'পক্ষ লেনদেন করে নিত"। এছাড়া সে যখনই বাইরে থেকে সফর করে ফিরত, যেসব ক্যাডারদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হত, তাদের জন্য কিছু উপহার নিয়ে আসত। চীনে এই অভ্যাস এতই চালু হয়ে গিয়েছিল যে এটাকে চেনরা খারাপ চোখে দেখত না ততদিন, যতদিন লঙইয়ঙ সকলের সুবিধার জন্য গ্রামের বাইরের জগতে এটা করছে বলে সকলে মেনে নিয়েছিল। গ্রামে অবশ্য সে এক ধরনের মিতব্যয়ী দুর্নীতিহীন জীবনযাপন করত। ব্রিগেডের মিটিংয়েও সে অন্যদের মতো খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস থেকে নিজেকে দূরে রাখত। ফলে গ্রামবাসীরা তাকে অন্য ক্যাডারদের চেয়ে ভালো মনে করত।

'বোকা'-র চ্যালেঞ্জ

লঙইয়ঙ তার মর্যাদা আর ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছাতে চলেছিল। কিন্তু ব্রিগেড রাজনীতিতে ক্রমাগত সে নতুন স্পষ্ট বক্তব্যের মুখোমুখি হচ্ছিল। একগুচ্ছ ছোটো কারখানা চালানোর জন্য যোগ্য পরিচালকের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের কাজ দেখভাল করা এবং নতুন কর্মোদ্যোগ টিমের প্রতিনিধি হিসেবে ব্রিগেডের বিপ্লবী কমিটিতে চেন সুমেই-কে তুলে আনা হল।

চেন সুমেই ছিল ১৯৫০-এর ভূমি সংস্কারের বীর এবং সে কাউন্টির কৃষি-যন্ত্রাদি কারখানায় পার্টি সেক্রেটারি পদে মনোনীত হয়েছিল। কিন্তু তার একটা মস্ত দোষ ছিল। চেন গ্রামে ভূমি সংস্কার পরিচালনার সময় সে এক জমিদারের বউকে ধর্ষণ করেছিল। ঘটনাটা নিয়ে কানাকানি হলেও তাতে সুমেইয়ের উন্নতিতে ছেদ পড়েনি। কিন্তু সে কাউন্টি রাজধানীতে গিয়েও ফুর্তি চালিয়ে যেতে লাগল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তাকে ধরা হল। তার রাজনৈতিক বিরোধীরা প্রকাশ্যে সমস্ত পুরনো কেচ্ছা পর্যন্ত খুঁড়ে বার করল। নৈতিক অধঃপতনের দায়ে সুমেইকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল

এবং তার পদচ্যুতি ঘটিয়ে সাধারণ চাষি হিসেবে তাকে চেন গ্রামে ফেরত পাঠানো হল।

শহর থেকে প্রেরিত যুবকেরা এবং আও সুমেই সম্পর্কে গোড়ার দিকে বলেছিল, "আমরা ভাবতাম ও একটা যৌনদানব"। অথচ গ্রামের চাষিরা তাকে 'পুরনো বিপ্লবী' হিসেবে শ্রদ্ধা করত। কারখানা পরিচালনায় তার অভিজ্ঞতা এবং কাউন্টিতে সম্ভাব্য সরবরাহকারী ও ক্রেতাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য অচিরেই সে ব্রিগেডের ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের প্রধান পদে মনোনীত হল। লঙইয়ঙ ছিল তার চেয়ে জুনিয়র। সুমেই পার্টিতে না থাকায় লঙইয়ঙ স্বস্তি পেয়েছিল। কিন্তু তার বিপদটা এল অন্যদিক থেকে।

১৯৬০ সালের দুই সদস্যের ওয়ার্কটিমের তত্ত্বাবধানে গ্রামের পার্টি শাখায় জনাছয়েক নতুন যুবক-চাষিকে সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল। লঙইয়ঙের কর্তাগিরির ঝোঁককে সামাল দেওয়ার জন্য দুই শিক্ষিত ও স্পষ্টবক্তা যুবককে ওই কমিটির ডেপুটি সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত করা হল। এদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিল বাইশ বছর বয়সের এক গরিব চাষি, লোকে তাকে 'বোকা' বলে ডাকত। সে মোটেই বোকা ছিল না। লোকে বরাবর বিশ্বাস করত, কোন দুষ্টআত্মার কোপ এড়াতে হলে বাচ্চার একটা যেমন-তেমন ডাকনাম দাও। বোকার বিধবা মা ছিলেন এক দৃঢ় মনের মানুষ, তিনি ছেলের ওই ডাকনাম দিয়েছিলেন। বোকা লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিল। ডেপুটি সেক্রেটারির পদ থেকে তাকে কমিউন পার্টি কমিটিতে চেন গ্রামের প্রতিনিধি করে পাঠানো হল। লঙইয়ঙ যখন পার্টি কমিটির মিটিংয়ে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, বোকা তার বিরুদ্ধে সোজা দাঁড়িয়ে যেত। লঙইয়ঙ তাকে নিজের অধিকতর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিত বটে। কিন্তু বোকা নিজের শিক্ষার জোরে পার্টির ওপরতলার নির্দেশের শব্দগুলো লঙইঙের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিত। আসলে লড়াইটা ছিল দুই প্রজন্মের।

লঙইয়ঙকে খোঁচা মারা চাট্টিখানি কথা নয়। বোকা তার এই আচরণের জন্য যুবক-চাষিদের কাছ থেকে তারিফ পেল। কিন্তু পরিশ্রমে সে যে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে সেটা বোকা দেখাতে পারেনি। তার চাষের জ্ঞানও তেমন ছিল না। লোকে এমনও বলত, সবসময় বোকা মিটিংয়ে যাচ্ছে, খাটছে কখন? বোকা জবাব দিত, আমার খাটবার সময় কোথায়? কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারছিল, আরও উঁচুতে উঠতে গেলে খাটুনির রেকর্ড খারাপ থাকলে চলবে না। তাই সে নিজেই একদিন ক্যাডারের কাজ ছেড়ে দিয়ে তার পুরনো উৎপাদন টিমে পূর্ণ সময়ের চাষির কাজে ফিরে এল। লঙইয়ঙ টের পেল, এতে বোকার সুবিধা হবে। সে কমিউনের পার্টিনেতাদের কাছে অভিযোগ করল, বোকা নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। কমিউনের নেতারা 'পার্টি শৃঙ্খলার অভাব'-এর জন্য বোকাকে সমালোচনা করল। শেষে একটা সমঝোতা হল, বোকার প্রধান কাজ দেওয়া হল গ্রাম্য প্রশাসনের মিলিশিয়ার প্রধান হিসেবে। নিয়ম অনুযায়ী এই পদে থেকে সে বছরে দু'শ দিন পর্যন্ত শ্রম করতে পারে। সে মনে করল, এতে তার পক্ষে রাজনৈতিক মর্যাদায় লঙইয়ঙকে টপকে যেতে অসুবিধা হবে না।

আওয়ের রাজনৈতিক আনুগত্যে চিড়

শহর থেকে প্রেরিত যুবকেরা গ্রামে জুনিয়র ক্যাডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে বোকার মতো গ্রামের কিছু চাষিঘরের ছেলে তাদের 'বিপ্লবী উত্তরসূরী' হয়ে উঠল। আও পরে কিছুটা অভিযোগের সুরে মন্তব্য করেছিল : "আমরা রেশম গুটিপোকার মতো গুটি বুনে যেতাম আর যাকে জন্ম দিতাম তার জন্যই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলতাম।"

আওয়ের মতো মাও চিন্তাধারার প্রচারকেরা গরিব ও নিম্ন-মধ্য চাষিদের সহজাত 'বিপ্লবী প্রকৃতি'-র কথা আওড়াত। চেনরাও শ্রেণী রাজনীতির প্রেক্ষিত ও চালু শব্দগুলো শিখে নিয়েছিল। কিন্তু সেটাই শহুরে যুবকদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়ার যুক্তিতে পরিণত হল। আও বলেছিল : "যখন ১৯৬৮ সালে আমাকে গ্রাম কমিটিতে নেওয়া হল না, আমি দমে যাইনি। আমি ভেবেছিলাম আমাকে আমার পারিবারিক প্রভাবের বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট রেখা টানতে হবে এবং সেই পরীক্ষায় আমি টিকে থাকতে পারব। ওরা ব্যাখ্যা করেছিল, আমাদের মতো লোকেদের পারিবারিক উৎস ভালো নয়, অতএব আমাদের লম্বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ... কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মধ্যে পরিবর্তন এল ... এখন আমি সব কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমাদের মর্যাদা তো কেবল কমতেই থাকছে।"

যে আও দৃঢ় শ্রেণী লাইন আর খারাপ শ্রেণীর লোকেদের প্রতি বৈষম্যকে কট্টরভাবে সমর্থন করত, সে-ই বলেছিল : "আমার মনে হল, 'দেখুন, আমার পারিবারিক ভিত্তি তো আমার পছন্দে তৈরি হয়নি। যদি আমি কিছু অন্যায় করতাম তাহলে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা যেত। কিন্তু অন্যথায় নয়।' যদি তোমার শ্রেণী ভালো না হয়, পার্টি সর্বদা তোমার আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন করবে; সবসময় তারা মনে করবে, তুমি যে ভালো কাজ করছ, সেটা তোমার ব্যক্তিগত উন্নতির স্বার্থে। তারা তোমাকে খতিয়ে দেখবে না। এইভাবে মানুষকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে ফেলা আমার ভালো লাগল না ... সামান্য ভালো শ্রেণী থেকে আসা মূর্খতম লোকও বিরাট ভান করত।"

গ্রামের লোকে প্রেরিত যুবকদের আশাভঙ্গ নিয়ে কখনই মাথা ঘামায়নি। তারা দেখেছিল, সরকারি নীতি ক্ষণে ক্ষণে বদলে যেত। একটা নীতি অনুযায়ী যুবকদের বাইরে থেকে আনা হল, আবার আর একটা নীতিতে তাদের শহরে ফিরিয়ে নেওয়া হতে পারে। এই বহিরাগতদের কাউকে কাউকে চেনরা পছন্দ করত বটে, কিন্তু তারা সকলেই ছিল দীর্ঘস্থায়ী বেড়াতে আসা লোক। ব্রিগেড নেতাদের বাস্তববুদ্ধিতে গোড়া থেকেই এদের সম্পর্কে এরকম পরিকল্পনাই ছিল। সরকারি অর্থে যে ডর্মিটরিটা ব্রিগেড থেকে এদের থাকার জন্য বানানো হয়েছিল, সেটা ছিল চিরাচরিত গুয়াঙদঙ শস্যগোলার মতো দেখতে। আশা ছিল, যুবকেরা চলে গেলে ওটা একটা ভালো কাজে লাগবে। অতএব এদের চেন গ্রামে বিয়ে-থা, সংসার পাতা নিয়ে কোন চিন্তা কেউ করত না।

কিন্তু সত্তরের গোড়ায় যখন এই যুবকেরা গ্রামে রয়ে গেল, তাদের বয়স বিশ পেরিয়ে গেল। একজন যুবক বলেছিল : "আমরা বুঝতে পারছিলাম বয়স আমাদের বাড়ছে; ভাবনা হচ্ছিল, কীভাবে বিয়ে-থা করব? ... বাচ্চাকাচ্চা সংসার হলে আমাদেরও বেসরকারিভাবে শুয়োর পালন, ঘাসকাটা এবং ব্যক্তিগত জমিতে কাজ করতে হবে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদেরও পরিশ্রম করতে হবে। আমরা তা সইয়ে নিতে পারব না। আমাদের পড়াশুনা আর বিশ্রামের সময় দরকার। কিন্তু সেদিকে গেলে আমরা পরিবারের আর্থিক মান বজায় রাখতে পারব না।"

তাছাড়া সরকারি নিয়ম ছিল, একলা মানুষ শহরে ফেরার সুযোগ পেতেও পারে। বিয়ে করলে তা হবে না। শহরে ফেরার সুযোগ নিয়ে, পার্টির স্বজনপোষণ নিয়ে এই যুবকদের ক্ষোভ ছিল। আও বলেছিল, "যখন ওপরতলার ক্যাডারদের ছেলেপুলেরা গ্রামে এল, তারা আবার একধাক্কায় বেরিয়েও গেল ... হা! তাহলে গ্রামাঞ্চলের জন্য স্বেচ্ছাকর্মের 'মহত্ত্ব' কোথায় গেল? হা! ওরা যদি ক্যান্টনে ফিরে যায়, আমরা কি তাহলে জঞ্জালের মতো এখানে পড়ে রইব?"

আওয়ের এই ক্ষোভকে প্রভাবিত করেছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শেষে ১৯৬৮-র শরতে আসা চল্লিশজন নতুন বালক-বালিকা। শহরে তখন

রেডগার্ডের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল, বেকার সমস্যাও বাড়তে চলেছিল শহরে, ক্যান্টনের হাইস্কুল ছাত্রদের তিন-চতুর্থাংশকে স্থায়ীভাবে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৪-র যুবকদের মতো এদের গ্রামে থাকা বা স্বেচ্ছায় শ্রম করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু একধরনের যৌবনের আদর্শবোধ অনেকের ছিল। আওয়ের ছোটো বোনও এদের মধ্যে ছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়কার শহুরে বিতর্কে অংশ নিয়ে স্বাধীন চিন্তার একটা ধরন এই ছাত্রদের কারো কারো মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এরা নেতৃত্ব সম্পর্কে সংশয়ী ছিল এবং নিজে থেকে একটা রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার আগ্রহও এদের ছিল। আও বলেছিল : "সেইসময় আমি পার্টিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম; মাওয়ের ওপর আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। যখন আমার বোন ওপরতলার নেতৃত্বকে পরোক্ষভাবে সমালোচনা করত, আমি বলতাম, 'তুমি যদি আর একবার এসব বলো, আমি রিপোর্ট করব। আমি গরিব আর নিম্ন-মধ্য চাষিদের দিয়ে তোমায় শায়েস্তা করব!' কিন্তু পরে ধীরে ধীরে আমি পাল্টাতে থাকলাম। আমি অনুভব করলাম, ও যা বলছে তা বাস্তবিক। ... আমার বোন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গেছে, যেখানে ক্যাডারদের দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে উত্তেজিত কথাবার্তা ওদের হয়েছে। ও বলত, আমাদের দেশ যথেষ্ট গণতান্ত্রিক নয়। জনসাধারণকে ওপরতলার লোকেদের কথা, না ভেবে পুরোপুরি পালন করতে হয়।"

এই নবীনেরা কেউ কেউ মার্ক্সবাদী মৌলিক বই পড়ত। চার পুরনোকে ধ্বংস করার সংগ্রামে থেকে আগেকার যেসব বই বেঁচে গিয়েছিল, সেগুলোও এরা পড়ত। চারপাশের সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য একটা স্পষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি তারা অর্জন করতে চাইত। এরা যে পাঠচক্রগুলো তৈরি করেছিল, তাতে পুরনো যুবকেরাও কেউ কেউ যোগ দিয়েছিল। এদের আলোচনাগুলো সরকার-বিরোধী ছিল না। তখনও পর্যন্ত এরা চীনা বিপ্লবের প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করত এবং আখেরে চেয়ারম্যান মাওয়ের নেতৃত্বে বিশ্বাস করত। আও বলেছিল, 'আমার সমস্ত ভাবনায় এখন একটা প্রশ্নচিহ্ন পড়ে গেছে'। ১৯৭১-এর শেষে লিন পিয়াওয়ের ঘটনায় এদের চেয়ারম্যানের প্রতি বিশ্বাসে সন্দেহের কালো ছায়া এসে পড়ল।

লিন পিয়াওয়ের মৃত্যু

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে এক শীতের ঠান্ডা রাতে চেন গ্রামে পার্টি সদস্যদের ঘুম থেকে উঠে তড়িঘড়ি কমিউনের সদর দপ্তরে জরুরি মিটিংয়ে যেতে হল। দু'দিন কেটে গেল। ফিরে এসে তারা একটা টুঁ শব্দও করতে পারল না, এমনকী নিজের পরিবারের লোকের কাছেও মুখ খোলা বারণ ছিল। এরপর একে একে দলের বাইরের ক্যাডার, ইউথ লিগের সদস্য এবং অন্য নেতৃদায়ী কর্মীদের কমিউনে ডেকে নেওয়া হল। গ্রামের লোকে বুঝতে পারল, একটা রাজনৈতিক ঝড় ঘনিয়ে উঠছে। এই উচ্চ-নাটকীয় পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত ব্রিগেড হলে একটা জনসভায় সকলে ঘাবড়ে যাওয়া অবস্থায় উপস্থিত হল। এক প্রেরিত যুবক পরে বলেছিল : "গ্রামের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বন্দুক রেডি করে সভার চারপাশে টহল দিচ্ছিল, যাতে খারাপ শ্রেণীর লোকেরা ঘেঁষতে না পারে। শ্রেণীশত্রুদের নিশ্চয় এই খবর শুনতে দেওয়া যায় না। বোকা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পাঠানো একটা কাগজ পড়ল। তাতে বলা ছিল, কীভাবে লিন পিয়াও মাওয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং একটা বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ... চাষিরা [এবং আমরা] মর্মাহত হল। তারা ভয় পেয়ে গেল : 'কীভাবে মাওয়ের এত ঘনিষ্ঠ একজন এরকমটা করতে পারে?"

দু'দিনের সভার শেষে লিন পিয়াও সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য প্রত্যেক গ্রামবাসীর হাতে 'অধ্যয়ন' করার জন্য দেওয়া হল। এইসব সভার কৃত্রিম গুরুত্ব ও গোপনীয়তা থেকে লিন পিয়াওয়ের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বিপজ্জনক সত্যের এক অলৌকিক আভা ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষত মোটা মোটা দস্তাবেজ যেন অশিক্ষিত গ্রামবাসীর কাছে মাওয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য এবং লিন পিয়াওয়ের লুক্কায়িত শয়তানি চরিত্র সম্পর্কে এক জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হচ্ছিল। কিন্তু এত নাটক দিয়েও এক যন্ত্রণাদায়ক সংশয়কে এড়িয়ে যাওয়া গেল না। লিন পিয়াওকে মাওয়ের ঘনিষ্ঠতম কমরেড ও তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী হিসেবে তুলে ধরে প্রায় দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তারপর এত আচমকা তাঁকে দুষ্ট হিসেবে ঘোষণা করা হল। এক যুবক চাষি বলেছিল, "আমি মাওকে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু লিন পিয়াওয়ের ব্যাপারটাতে আমি চিন্তায় পড়ে গেছি। সব কিছু যেন ওপর থেকেই পাল্টায়। ওরা যা বলে তার সবটা বিশ্বাস করা যায় না।" সন্দিহান প্রেরিত যুবকদের মধ্যে লি নামে একজন বলেছিল : "যখন লিউ শাওচিকে টেনে নামানো হল, আমরা সমর্থন করেছিলাম। সেইসময় মাও সেতুঙকে অনেক উঁচুতে ওঠানো হয়েছিল : তিনি ছিলেন লাল সূর্য, কী ছিলেন না তিনি। আমরা দেখে এসেছি, ওপরের নেতারা আজ কোন কিছুকে গোল বলছে, কাল তাকে বলছে চ্যাপ্টা। ব্যাপারটাতেই আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি।"

চারচোখো উ গোয়ালঘরে কারাবাস করছিল। তার সম্পর্কে ওপরতলার শুনানি ঝুলেছিল তখনও। তার সম্পর্কে অভিযোগ ছিল মারাত্মক। সে নাকি ভাইস চেয়ারম্যান লিনকে 'ধুর্ত শেয়াল' বলেছিল। এখন লিনের ব্যাপারটা উল্টে গেল। এবার উকে গ্রামের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দেওয়া উচিত। কিন্তু পার্টির নীতির সঠিকতাকে রক্ষা করতে হবে। অতএব জিনঈ একটা গণ-বিবৃতি তৈরি করল, উয়ের বহুবিধ অপরাধ সত্ত্বেও পার্টি তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছে এবং উকে একটা অনুতপ্ত কৃতজ্ঞতার বিবৃতি দিতে হল। ব্যাপারটা আও এবং অন্য যুবকদের একটা বিচ্ছিরি ঠাট্টা মনে হল। প্রেরিত যুবকদের মধ্যেকার এক প্রাক্তন মাও প্রচারক বলেছিল : "সবটাই একটা ভণ্ডামি মনে হচ্ছিল। মাও পাঠের মাতামাতি কেটে গিয়েছিল। এমনকী যে লিন পিয়াও সবচেয়ে বেশি মাও অধ্যয়ন করেছিলেন এবং মাও পূজাকে উচ্চতম স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন — তাঁর ইতিমধ্যে পতন হয়েছে। অন্যদের আর সেই গান গেয়ে লাভ কী? এখন সকলের মনে সন্দেহের এই লুকোনো ছায়া।"

অনিচ্ছুক স্বেচ্ছাকর্মী

লিন পিয়াওয়ের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই প্রেরিত যুবকরা একটা দ্বিতীয় ধাক্কা খেল। আশপাশের জেলা থেকে ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় প্রেরিত যুবকেরা হঙকঙে পালিয়ে যাচ্ছিল। এই অভিবাসন ঠেকাতে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বেশিরভাগ প্রেরিত যুবককে হাইনানের ছ'টা সীমান্তবর্তী কাউন্টিতে রাষ্ট্রীয় ফার্মে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। ক্যান্টন থেকে তিনশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই বিশাল জঙ্গল ঘেরা দ্বীপে গত কয়েক বছরে সেনাবাহিনীর লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার অধীনে কুখ্যাত রাষ্ট্রীয় ফার্ম গড়ে তোলা হয়েছিল। সরকার বুঝতে পেরেছিল, কিছু প্রেরিত যুবক এই নির্দেশ এড়িয়ে যেতে ক্যান্টনে নিজেদের বাড়িতে পালিয়ে যেতে পারে। কর্মসূচি শুরুর আগেই সরকার ছ'টি কাউন্টির নদীপথ, বাসস্টপ এবং প্রধান রাস্তাগুলির সংযোগস্থলে অফিসারদের মোতায়েন করে।

চেন গ্রাম থেকে একটা বড়ো 'স্বেচ্ছাকর্মী'-র তালিকা তৈরির নির্দেশ পাঠালে প্রত্যেক যুবকই তাতে সই করে নিজেকে 'সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে উৎসর্গ' করার প্রমাণ দিতে চায়। নগ্নপদ চিকিৎসক, তাঁর প্রেমিকা, যারা সবচেয়ে কঠিন মেশিন সারাইয়ের কাজ করত, জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক, এবং (কমিউনের পরামর্শে) ১৯৬৮ সালে আসা ক্যান্টনের এক প্রভাবশালী অফিসারের মেয়েকে এই তালিকা থেকে বাদ রাখা হল। এতে আও খেপে

গেল। দক্ষতা আর পারিবারিক প্রভাবকে পুরস্কৃত করা হবে আর এক দশকের রাজনৈতিক আত্মত্যাগকে অসম্মান করা হবে? সে তার বন্ধুদের বলল, "একটা কুকুরকেও যদি দশ বছর পোষো, তুমি তাকে এভাবে লাথি মারতে পারো না। আমি কি একটা কুকুরের চেয়েও মূল্যহীন?" অথচ সময়টা ষাটের দশক হলে সে-ই হয়তো নিজেকে মডেল হিসেবে প্রমাণ করার তাগিদে প্রথমে গিয়ে সই করত। এখন সে-ই সবচেয়ে মুখর সমালোচক।

সে একটা সাইকেলে চেপে অন্য ব্রিগেডে তারই মতো একনিষ্ঠ এক বন্ধুর কাছে গিয়ে তার আপত্তির কথা জানালো। কিন্তু সেই মেয়েটি টেলিফোনে কমিউনের সদর দপ্তরে জানিয়ে দিল, আও অন্য ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ করছে এবং 'লোকেদের তাতাচ্ছে'। একটা সম্মেলনে কমিউনের পার্টি সেক্রেটারি চেন গ্রামের ক্যাডারদের আলাদা করে বললেন, "তোমরা আওকে পাঠাও। অন্য ব্রিগেডের লোকেরা বলছে, যদি আওয়ের মতো বিখ্যাত একজন কর্মী না যায়, তারা কেন যাবে?"

প্রেরিত যুবকদের মধ্যে স্টকি ওয়াঙ সম্প্রতি এক যুবতীকে বিয়ে করেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় এই মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। (পরে অবশ্য এই মেয়েটির সঙ্গে সে হঙকঙে পালিয়ে যাবে।) বিদেশি দেঙ এক স্থানীয় মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। যুবকদের ব্যাপারে ব্রিগেডের বিপ্লবী কমিটি কিংফাকে নিযুক্ত করেছিল। তিন বছর আগে এই তিনজনকে গোয়ালঘরে পাঠানোর ব্যাপারে আওয়ের সহায়তা ছিল। এবার হাইনানের রাষ্ট্রীয় ফার্মে যাওয়ার ব্যাপারে আওয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কর্মসূচিতে এরা তিনজন বিশেষ ভূমিকা নিল।

যে যুবকেরা গ্রামে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না, তারা স্বেচ্ছায় হাইনানে যেতে চাইল। চারচোখো উ কর্মী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য নিজেকে তালিকাভুক্ত করল। এদিকে আও, তার বোন সহ মোট পাঁচজন অনিচ্ছুক কর্মীর জন্য বিশেষ 'পাঠচক্র' সংগঠিত করা হল। সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এক ডজন ক্যাডার ও কর্মীকে দিয়ে তাদের বোঝানো হত। বিরক্ত এক গরিব চাষি প্রতিনিধি দ্বিতীয় দিন তার দিকে ঝুঁকে ফিসিফিস করে বলল, 'আও তুমি দয়া করে সই দিয়ে দাও। নাহলে আমাদের এখানে বসে বসে সময় নষ্ট করতে হবে'। ব্রিগেড নেতারা হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে ভয় দেখাতে শুরু করল। আও পরে বলেছিল, "যেহেতু আমি অন্য ব্রিগেডের লোকেদের যোগাযোগ করে যেতে বাধা দিয়েছি, ওরা বলল, আমাকে ধরা হবে। এমনকী আমার অতীত এবং আমার পরিবার, যেখানে আমার বাবা আর একবার [সাংস্কৃতিক বিপ্লবে] রাজনৈতিকভাবে কলঙ্কিত হয়েছে, সেগুলোও দেখা যেতে পারে। ওরা বলল, আমার কার্যকলাপ এখন আমার প্রকৃত শ্রেণী চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছে।" আও পরিণামটা আন্দাজ করে প্রকাশ্যে সই করে দিল বটে। কিন্তু সই দেওয়ার সময় সে জড়ো হওয়া সমস্ত প্রেরিত যুবকদের সামনে ক্রুদ্ধভাবে জানালো, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হল।

তালিকাভুক্ত যুবকদের 'স্বেচ্ছাকর্মী' হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়ার আগে ক্যান্টনে বাড়িতে পরিবারের কাছে বিদায় জানাতে দেওয়া হল। সেখানে গিয়ে তারা আবিষ্কার করল, তারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারত। তাদের বাবা-মায়েরাও দুর্বিষহ হাইনানে না পাঠিয়ে তাদের বেআইনিভাবে শহরে রেখে দিতে প্রস্তুত ছিল। কিংফাকে ওদের ক্যান্টন থেকে নিয়ে আসার জন্য পাঠানো হল। শহরের প্রতিবেশি পার্টি কমিটি যুবকদের পাঠানোর ব্যাপারে বাড়তি দায়িত্ব নিতে চাইল না। কিংফা নিজেই ঘরে ঘরে হতাশ হয়ে ঘুরতে লাগল। বারবার বাড়ির লোকেরা তাদের ছেলেদের লুকিয়ে রাখছিল। একজন ক্রুদ্ধ অভিভাবক তো সামনের দরজায় এসে বলেই ফেললেন, "আমরা তো আমাদের বাচ্চাকে শিক্ষার জন্য তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কেন তোমরা ওদের হাইনানে পাঠানোর চেষ্টা করছ?" ক্যান্টনে কিংফা চাপাচাপি করার সাহস দেখাল না।

মাসের পর মাস যুবকেরা ঘরে বসে রইল। ক্যান্টন জুড়ে অভিভাবকদের বিরোধিতা এত জোরালো ছিল, প্রাদেশিক সরকার শেষ পর্যন্ত তাদের নির্দেশ তুলে নিতে বাধ্য হল। স্বীকার করা হল, যুবকদের ভুলভাবে হাইনানের জন্য সই করানো হচ্ছিল। আও এবং অন্য যুবকেরা চেন গ্রামে ফিরে এল। ব্রিগেডের ক্যাডাররা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, তাদের বাধ্য হয়ে নির্দেশ পালন করতে হচ্ছিল। কিন্তু শহুরে যুবকদের সঙ্গে ক্যাডারদের খিঁচটা স্থায়ী হয়ে রইল।

চেন গ্রামের শহুরে যুবকেরা ক্রমাগত হঙকঙে যাওয়ার জোয়ারে ভিড়ে গেল। পাশাপাশি কমিউন ও ব্রিগেডে ইতিমধ্যেই হঙকঙে যাওয়ার জোর হাওয়া বইছিল। আওয়ের কাছে পুঁজিবাদী হঙকঙ ছিল এক 'অধঃপতিত শহর' (সে এখনও তাই মনে করে)। সে আরও দু'বছর চেন গ্রামে রয়ে গেল। কিন্তু যখন একের পর এক প্রেরিত যুবক সেই ব্রিটিশ কলোনিতে চলে যাচ্ছে, সে দেখল : "গ্রামের জীবনের একটা মূল্য এবং অর্থ আমার কাছে ছিল। এখন সেটা পাল্টে গেছে। এখন আমি মনে করি, জনগণ আর ক্যাডাররা শুধু নিজেদের জন্যই করে যাচ্ছে। ... অতএব আমি গ্রামাঞ্চলে থেকে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই না। যদি সেখানে জনগণের একটা আত্মত্যাগী মনোভাব থাকত, আমি থাকতাম। এমনকী বস্তুগত একটা দরিদ্র জীবনযাপন করে পরিবার ছাড়াই আমি থাকতাম সেখানে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, কিছুই হবে না। আমি হঙকঙে দুধরুটি খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য চলে এলাম।"

১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মে আও তার একসময়কার বিরোধী লিয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ হেঁটে জলে নেমে পড়ল। চেন গ্রামে এক দশকের কঠিন কাজের মধ্য দিয়ে অর্জিত দৈহিক শক্তিতে টানা পাঁচ ঘন্টা সাঁতরে সে বিদেশের নতুন জীবনে প্রবেশ করল।

সবুজ বিপ্লব বর্জন

প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে নতুন 'যাদু' বীজ, সার এবং উন্নততর জলের ব্যবস্থা সবুজ বিপ্লব এনেছিল চেন গ্রামে। চাষের উন্নতি হল। সাথে সাথে আরও উন্নত হাইব্রিড বীজ, নতুন প্রযুক্তি এবং আরও সারের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৬৬-৬৮ তিনবছর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় প্রাদেশিক বীজ গবেষণা কর্মসূচি প্রথম বাধা পেল। মাওবাদী নেতৃত্ব বলেছিল, ভদ্দরলোকেদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন'। যত কৃষিবিদ ও উদ্ভিদবিদদের তখন গ্রামীণ জেলাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাও সেতুঙ মারা যাওয়ার পর সবুজ বিপ্লবের নীতি আবার ফিরে এসেছিল। ১৯৭৮ সালের ৭ মে পিপ্‌লস ডেলিতে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল : "কেন গ্রামাঞ্চলে কাজ করা শ্রমের মর্যাদা পাবে, অথচ পরীক্ষামূলক জমিতে কাজ করা শ্রমের মর্যাদা পাবে না?"

চেন গ্রামের সবুজ বিপ্লব জাপান থেকে আমদানি করা নাইট্রোজেন-অ্যামোনিয়া সারের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। সত্তরের দশকে জেলা ও গ্রামগুলিতে এই সারের সরবরাহ ঠিক মতো হচ্ছিল না। স্বনির্ভর স্থানীয় শিল্প গড়ে তোলার জাতীয় কর্মসূচি অনুযায়ী কাউন্টি সরকার একটা ছোটো সারের কারখানা তৈরি করল। কিন্তু এই স্থানীয় সারের মান এতই খারাপ হল, গ্রামের উৎপাদন টিমগুলি তার পিছনে অর্থব্যয় করতে চাইল না।

দেঙ শিয়াও পিঙের নির্জন গবেষণা প্রকল্পের বদলে পার্টির বিপ্লবী লাইন এল — গ্রামের ভিতরই 'খোলামেলা পরীক্ষানিরীক্ষা' করা হোক।

চেন গ্রামের চাষিদের গাছের বৃদ্ধির জন্য হরমোন তৈরির এক প্রকল্পে যোগ দিতে বলা হল। হাইস্কুলে বিজ্ঞান পড়া প্রেরিত যুবকদের দশ দিন ধরে তালিম দিয়ে ব্রিগেডের গুদামঘরের এক কোণে পরীক্ষাগার গড়তে দেওয়া হল। কয়েকমাস ধরে তারা 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতিতে হরমোন প্রস্তুত করার চেষ্টা করল। শেষপর্যন্ত তারা কিছুটা সফলও হল। দু'বছর কাজ করে তারা যে জিনিসগুলো আবিষ্কার করল, তা চাষিদের কোন কাজে লাগল না। উৎপাদন টিমের লোকেরা দেখল, এই যুবকেরা পরীক্ষাগারে হেসে খেলে যে কাজ করছে, তার বদলে দিনভর মাঠের কাজ হতে পারত। ১৯৭৩–৭৪ সালে উৎপাদন টিমগুলি এবং ব্রিগেড 'জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গবেষণা'র এই প্রকল্পে অর্থব্যয় বন্ধ করল।

১৯৭০–৭১ নাগাদ পার্টির ওপরতলার নেতৃত্ব নির্দেশ পাঠাল, গুয়াঙদঙ প্রদেশের সমস্ত গ্রামে তুলো চাষ করতে হবে এবং শীতের সময় গম ও জোয়ার লাগাতে হবে। কারণ হিসেবে তারা জানিয়েছিল, উত্তর চীনে সোভিয়েত আক্রমণ হলে চাষের ক্ষতি হবে। প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া এই গুয়াঙদঙে, কখনই এই ফসল ভালো হতে পারে না। কিন্তু চেন চাষিরা শুনতে পেল, পাশাপাশি অন্য গ্রামে যারা এই কর্মসূচি নিয়ে আপত্তি করেছে, তাদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। অতএব কয়েক একর জমিতে ওইসব বীজ লাগাতে হল। কিন্তু তৃণমূল স্তরের বাস্তবতাকে উচ্চতর নেতৃত্ব আমল দিল না। শুধু চেন গ্রামই নয়, গুয়াঙদঙের প্রায় সমস্ত গ্রামগুলিতে কয়েক বছর ধরে এই 'পরীক্ষা' চলল।

পার্টির নির্দেশ : তাচাই থেকে শেখো!

দেশজুড়ে কর্মসূচি এল, তাচাইয়ের সমকক্ষ হও। অর্থাৎ পাহাড়ের ঢালগুলোকে ভেঙে সমান করে নতুন জমি সৃষ্টি করো। ওপর থেকে চাপ এল, ব্রিগেডের নেতারা উৎপাদন টিমগুলোকে কয়েকটা বড়ো ট্রাক্টর ও বুলডোজার ভাড়া করে নিতে বলল। খোঁড়াখুঁড়ির ফলে ওপরের মাটি সরে নিচের একটা অনুর্বর হলুদ মাটির স্তর বেরিয়ে পড়ল। সেই ন্যাড়া জায়গাটা বোজাতে হবে, মাটি দিয়ে ভরাট করা প্রয়োজন। সেবছর শীতে চেন চাষিরা গোটা গ্রাম খেটে একমাস ধরে অন্য জায়গা থেকে মাটি এনেও প্রয়োজনের ভগ্নাংশও পূরণ করতে পারল না। সেই সামান্য ভরাট অংশের জন্য সারের ব্যবস্থা হল না। শেষপর্যন্ত বীজ না বুনে কিছু গাছ লাগাতে হল নতুন ওই জমিতে। নতুন এই ন্যাড়া মালভূমির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের লোকে মজা করে বলত : "হা! তাচাই থেকে শেখার উত্তম দৃষ্টান্তই বটে! তাচাই আমাদের জমি সমান করে গাছ লাগাতে শিখিয়েছে!"

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় প্রাদেশিক, কাউন্টি এবং কমিউন পার্টি সংগঠনগুলি খুবই নাস্তানাবুদ হয়েছিল। সেই কারণে ওপর থেকে কোন কর্মসূচি এলে তার প্রতি অনমনীয়ভাবে আনুগত্য দেখানোই ছিল নিরাপদ। সেই চাপটাই পর্যায়ক্রমে গ্রামস্তর পর্যন্ত নেমে আসত। পার্টির একেবারে ওপরতলায় দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে এক গোষ্ঠী হয়তো জোরদার হয়ে উঠল, তখন পরবর্তী স্তরের নেতাদের হাওয়া বুঝে দ্রুত নীতি পাল্টে নিতে হত।

যখন মাওয়ের একটা উদ্ধৃতি জাতীয় প্রচারমাধ্যমে আসত — "কৃষি, বন এবং শুয়োর–মুরগি পালনের সঙ্গে পার্শ্ব উৎপাদন হিসেবে মৎস্যচাষকে এগিয়ে নাও" — চেন গাঁয়ের লোক নতুন বহুবিধ উৎপাদনের আশায় দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠত। মাছচাষের পুকুর বেড়ে যেত। আবার যেই মাওয়ের অন্য উদ্ধৃতি মারফত শস্য উৎপাদনে প্রধান গুরুত্ব দেওয়ার উপদেশ আসত, গ্রামের লোক নতুন পুকুরগুলো বুজিয়ে ফের ধানচাষে ফিরে যেত। মধ্যবর্তী পার্টি–আমলারা হঠাৎ হঠাৎ ঘোষণা করত, গোপালন এবং শাকসবজি চাষ রাজনৈতিকভাবে সন্দেহজনক — 'মুনাফার পিছনে ছোটা'। পালিত জন্তুগুলো বেচে দিয়ে সবজির বদলে ধানচাষ করতে হত চেন চাষিদের। এতে উৎপাদন টিমের পরিশ্রম আর পুঁজি দুই–ই বরবাদ হত এবং মাঠের উৎপাদনশীলতা মার খেত।

চার সংশোধন কর্মসূচির সময় ওয়ার্কটিম গ্রামের স্বার্থে কিছু সময়সাপেক্ষ প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। সেই ওয়ার্কটিম চলে যাওয়ার পর চাষিরা নিজেদের বুদ্ধিতে কিছু শ্রমনিবিড় প্রকল্পের মাধ্যমে চাষের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়েছিল। এখন তারাই ফের শিখল, সমস্ত ওপরতলার নির্দেশকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না; বাইরে থেকে আসা নতুন কর্মসূচির প্রতি তাদের ক্ষোভ জন্মাচ্ছিল। সত্তরের দশকের শেষে চেনরা শুধু চাইছিল, রাষ্ট্র তাদের উৎপাদন টিমগুলোকে একলা ছেড়ে দিক।

শস্য আদায় এবং এক ছোট্ট রাজনৈতিক সংকট

চেন গ্রামে চাষের মন্দা চলছিল। অথচ রাষ্ট্র হঠাৎ হঠাৎ নতুন কর্মসূচি মারফত শস্য আদায় করে নিত। এতে চেনরা বিরক্ত হত। কখনও 'আনুগত্যের শস্য', কখনও 'ভিয়েতনামের জন্য শস্য', বা [সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে] 'যুদ্ধ–প্রস্তুতির জন্য শস্য' ইত্যাদি শ্লোগান তুলে শস্য আদায় করত রাষ্ট্র। সস্তা দরে গ্রামের উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডার থেকে শস্য তুলে দিতে হত রাষ্ট্রের হাতে।

১৯৭১ সালে কাউন্টি এক নির্দেশ নিয়ে এল : গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের পাওনা রেশনের দশভাগের একভাগ শস্য চাষিদের হাতে না দিয়ে উৎপাদন টিম সঞ্চয় করে রাখবে। সেই সঞ্চয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সোভিয়েত আক্রমণের ক্ষেত্রে গ্রামের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা হবে। এই কর্মসূচিতে উৎপাদন টিমকে 'স্বেচ্ছামূলকভাবে' অংশ নিতে বলা হল। চাষিরা যতই বিরক্ত হোক না কেন, আপত্তি করার পরিণাম জানত।

কিন্তু টিমের এক সভায় সানওয়াঙ একাই নীতির প্রতিবাদ করে বসল। সে ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্বদায়ী ছোটো গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান। এক প্রাক্তন সৈনিক এবং পার্টি সদস্য হিসেবে টিমের সাথীদের মধ্যে তার যথেষ্ট সম্মান ছিল। সে বলল : "আমি অবশ্যই চেয়ারম্যান মাওয়ের কোন কর্মসূচির বিরোধিতা করছি না। এইসব নতুন দাবি চেয়ারম্যানের তৈরি করা মৌলিক নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। পরিবারের মধ্যে বন্টনযোগ্য কোন শস্যের ওপর হাত ছোঁয়ানো যায় না। তোমাকে অবশ্যই জনগণকে যথেষ্ট খাবার দিতে হবে। উদ্বৃত্ত শস্য নিয়ে ওরা বলতে পারে, কিন্তু বন্টনযোগ্য শস্য নিয়ে বলতে পারে না।"

ক্রুদ্ধ সানওয়াঙের বক্তব্যকে টিম উড়িয়ে দিতে পারল না। ব্রিগেডে রিপোর্ট গেল, টিম কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। অন্য টিমগুলোও অপেক্ষা করে দেখতে চাইল, সানওয়াঙের টিমকে কীভাবে মানতে বাধ্য করা হয়। পার্টির চেন গ্রাম শাখা কমিটির সভায় সানওয়াঙের কাছ থেকে 'পার্টি শৃঙ্খলা' দাবি করা হল। ব্রিগেডের দপ্তরের বাইরে থেকে সেই সভার চেঁচামেচি চাষিদের কানেও পৌঁছাল। ব্রিগেড থেকে কমিউনে রিপোর্ট করা হল। কমিউনের পার্টি কমিটি বুঝতে পারল, সানওয়াঙের দৃষ্টান্ত অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে তারা সানওয়াঙের সমালোচনার জন্য সাধারণ সভা ডাকল। সানওয়াঙের রাজনৈতিক রেকর্ড এবং শ্রেণী ভিত্তি ভালোই ছিল। ফলে সে ভেঙে পড়ল না। কিন্তু গোলমাল বাধালো তার স্ত্রী। সে ভয় পেয়ে গিয়ে টিমের একটা সভায় সানওয়াঙের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল। রেগে গিয়ে সানওয়াঙ মেয়েদের বসার জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে স্ত্রীকে পিটতে শুরু করল। মেয়েদের কয়েকজন মিলে স্বামী–স্ত্রীকে ছাড়িয়ে নিল।

হাতাহাতির ফলে সানওয়াঙের আতঙ্ক অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হল। তার টিম শস্যের জন্য পার্টির 'অনুরোধ' মেনে নিল। টিম–ব্রিগেড–কমিউন সম্পর্কের মাঝে ছোট্ট সংকট কেটে গেল। কমিউনের নেতারা ভাবল, তারা জিতে গেছে। এর পরে অন্য এক আচমকা পার্টি–নীতি বদল করার সময়

উদ্বৃত্ত শস্য সংক্রান্ত কর্মসূচি কিন্তু ধোপে টিকল না। এই কর্মসূচিকে কার্যকর করার দায় চাপল পতনোন্মুখ লিন পিয়াওয়ের ঘাড়ে। সেই শস্য পরে পরিবারগুলোকে ফিরিয়ে দিতে হল। শেষপর্যন্ত সানওয়াঙেরই জয় হল। পার্টির প্রতি ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ ও হতাশ চাষিদের মধ্যে থেকে ঝড়ের মতো এক বীরের উদয় হল।

সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে পার্টি–আমলারা 'রাজনীতির অগ্রাধিকার' (পলিটিক্স ইন কমান্ড) শ্লোগানের মধ্য দিয়ে নিচেরতলার বিক্ষুব্ধদের জব্দ করার মতো বাড়তি ক্ষমতা হাতে পেয়েছিল। আও পরে বলেছিল : "শ্রেণীর সাধারণ স্তরের শোধন কর্মসূচির পর বিশেষত ওপরতলার লোকেরা 'স্থানীয় রাজত্ব'–কে সামলানোর জন্য কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে পারত, যাতে স্থানীয় ইউনিটগুলো যা খুশি তাই না করতে পারে। আমাদের ওপরের স্তর নিজেদের সর্বহারার সদর দপ্তর হিসেবে জাহির করত এবং তাদের নিচের স্তরের লোকেদের চমকে দেওয়ার জন্য মাওয়ের উদ্ধৃতি ব্যবহার করত, এসবের ফলে চেন গ্রামের ওপর কাউন্টি এবং কমিউনের শাসন শক্তিশালী হয়েছিল।"

উৎপাদন টিমের নেতারা যেহেতু চাষিদের সন্তুষ্ট করে সরাসরি উৎপাদন পরিচালনা করত, তারা ব্রিগেড নেতাদের তুলনায় কমিউন এবং ওপরতলার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বেশি চাইত। যদি রাষ্ট্র বেশি ঝামেলা করে তাহলে টিমের দায়িত্ব ছেড়ে সাধারণ চাষি হয়ে যাব, এমন কথাও কেউ কেউ বলত। এই দুইয়ের মাঝে ব্রিগেডের ক্যাডারদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে চাপের। ক্যাডাররা যদি ওপরতলার নির্দেশ লাগু না করতে পারে, তাহলে তাদের পার্টি সদস্যপদ থেকে সাসপেন্ড করা হবে, এই ভয় ছিল। এদিকে চাষিদের ক্ষোভ যে বাড়ছিল, সেটাও ক্যাডাররা সরাসরি টের পাচ্ছিল।

লঙইয়ঙের মুর্খামি

লঙইয়ঙ ব্রিগেডের নেতা হলেও চেন গ্রামের স্বার্থরক্ষায় লড়াকু হিসেবে নিজের প্রতিপত্তি কায়েম করতে পেরেছিল। কমিউন কমিটি থেকে কোন 'নির্দেশ' এলে, সেটা যদি গ্রামের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হত, সে জনসমক্ষে জোরালো প্রতিরোধ করত। কিন্তু আরও ওপরতলা থেকে 'অনুরোধ' এলে, সে তার সপক্ষে তর্জন–গর্জন শুরু করে দিত। এর ফলে এই ধরনের ক্যাডারদের আচরণ সকলের কাছে ভণ্ডামি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যদিও ক্রমাগত পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার ডামাডোলে এইসব ক্যাডাররা নানারকম চালাকির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের কেরিয়ার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

ওপর ও নিচে দু'রকম কথা বলে লঙইয়ঙ চেনদের মধ্যে সম্মান বজায় রেখেছিল। কিন্তু যতদিন তার ব্রিগেড স্তরের শিল্প–উদ্যোগগুলো সফল হচ্ছিল, ততদিনই তা বজায় ছিল। ইট কারখানা, শস্যকল, চিনাবাদাম থেকে তেল তৈরির কল থেকে ভালো লাভ হত এবং গ্রামবাসীও সেগুলো থেকে সুবিধা পেত। চিনি ও অ্যালকোহল শোধনাগার থেকে লাভ হত কম। আশপাশের জেলার চাষিরা ছিল গরিব। তাদের ভোগ্যপণ্য কেনার সামর্থ ছিল কম। প্রথমদিকে চেন গ্রামের শিল্পায়নের সাফল্য লঙইয়ঙের মনে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে অন্য কয়েকটি গ্রাম সফর করে এসে সে গ্রামে একটা কাগজকল তৈরির পরিকল্পনা নিল। কমিউন কর্তৃপক্ষ বলল : "যখন প্রত্যেক কমিউন শহরে এইরকম কারখানা নেই (প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে), একটা ছোটো কৃষি ব্রিগেড কীভাবে তা চালাবে?" ব্রিগেডের অন্যরাও মৃদু আপত্তি করল। তারা জোরালো বিরোধিতায় গেল না, কারণ পরিকল্পনাটা ফলপ্রসূ হলে তারা রক্ষণশীল প্রমাণ হয়ে যাবে। নতুন প্রকল্প শুরু হল। অন্যত্র এই ধরনের প্ল্যান্ট জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করে লাভজনকভাবে চলত। কিন্তু এখানে তেলে চালানো জেনারেটর আনতে হল। কাগজ তৈরির জন্য আখের মণ্ড এবং বাঁশপাতার দরকার হল। তার সঙ্গে লাগল দামি রাসায়নিক। এত বড়ো খরচ করে যা উৎপন্ন হল, তার মান খুবই খারাপ। শেষপর্যন্ত এই প্ল্যান্ট বিক্রি করে দিতে হল। ব্রিগেডের এতে ২০,০০০ ইউয়ান ক্ষতি হল। এছাড়া বড়ো করে নতুন অডিটোরিয়াম তৈরি করার জন্য পরে গ্রামের সুনাম হয়েছিল বটে। কিন্তু সেসময় কাগজকলের উদ্যোগ মাঠে মারা যাওয়ায় লঙইয়ঙের কিছু মন্তব্য শুনতে হচ্ছিল। লোকে বলছিল, গ্রামে চাষের যখন অবনতি হচ্ছে, তখন এত খরচ করে এই বিশাল অডিটোরিয়াম কী কাজে দেবে?

লঙইয়ঙ নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে বন্যা রোধ করার জন্য বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা নিল। ভাটির দিকের গ্রামগুলি এতে আপত্তি করল। লঙইয়ঙ তাদের কথায় আমল দিল না। কয়েকটি গ্রাম থেকে ওপরতলায় অভিযোগ করা হল। বাঁধের দুই–তৃতীয়াংশ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর কাউন্টি প্রশাসন কাজ বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিল। চেন চাষিদের কয়েক হাজার শ্রমদিন এইভাবে লঙইয়ঙের মুর্খামির জন্য বরবাদ হল।

চাষির উপার্জন নিয়ে গোলমাল

রাষ্ট্রের নানা অকার্যকর পরীক্ষামূলক কর্মসূচির জন্য উৎপাদন টিমগুলোর শ্রমসম্পদের ওপর ভয়ানক চাপ পড়ছিল। তার ওপর লঙইয়ঙের নতুন শিল্পোদ্যোগগুলোতেও মাঠ থেকে কাজের লোক টেনে নেওয়া হচ্ছিল। এতে টিমগুলোর মধ্যে ক্ষোভ ছিল। এছাড়া ফ্যাকট্রিতে যারা গিয়েছিল, তাদের উপার্জন বেশি হত। সেটাও মাঠের কঠিনতর শ্রমে নিযুক্ত চাষিদের অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলেছিল।

চাষের বর্ধিত কর্মসূচির ব্যর্থতা, শ্রমশক্তিতে ঘাটতি, লঙইয়ঙের হিসেবের ভুল এবং চাষিদের উদ্দীপনার অভাবে সমষ্টিগত চাষে আয় ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩–এ কমে গেল এক–তৃতীয়াংশ। চীনা সংবাদমাধ্যমে (যেমন পিপল্‌স ডেলি, ১৭ মার্চ ১৯৭৮) থেকে পাওয়া যায়, অন্য গ্রামেও উপার্জনের এই অবনতি দেখা গেছে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর একটি গ্রামের অপেক্ষাকৃত ধনী টিমের সবচেয়ে কর্মক্ষম পুরুষ শ্রমিকের টিমের খেতের কাজ থেকে দৈনিক উপার্জন (ইউয়ানে) :

১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯	১৯৭০
০.৫০	০.৮০	০.৯০	১.০০	১.১৫	১.১০	১.০০
১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭
১.০০	০.৯০	০.৮০	০.৮০	০.৪৫	০.৮০	০.৭০

১৯৭৫ সাল ছিল ভয়ানক খারাপ আবহাওয়ার বছর। চেন গ্রাম থেকে ১০০ মাইলেরও কম দূরত্বে হঙকঙের ১৩০ বছরের ইতিহাসে এটাই ছিল তৃতীয় আর্দ্রতম বছর; শীতকালে রেকর্ড ঠান্ডা পড়েছিল সেখানে। ১৯৭১ সালে চেন গ্রামের সবচেয়ে ধনী টিমের সবচেয়ে ভালো শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল ১.১০ ইউয়ান আর সবচেয়ে দরিদ্র টিমে ছিল ০.৬০–০.৭০ ইউয়ান। আয়ের এই তফাতটা একই টিমের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়ের তফাতের চেয়ে বেশি ছিল।

সব টিমেই বিশেষত সবচেয়ে সমর্থ শ্রমিকের অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল। তাচাই মজুরি ব্যবস্থায় তাদের সঙ্গে টিমের দুর্বলতম ও অলসতম সাথীর মজুরির তফাত কম ছিল। নিচের দিকের অংশটা উচ্চতর ব্যক্তিগত আয়ের জন্য সবসময় চেঁচামেচি করত। যেহেতু প্রতি বছর উপার্জন বাড়ছিল, ফলে সবচেয়ে ভালো শ্রমিকেরা আয়ের সামান্য তফাত নিয়ে ঘামাত না। কিন্তু এখন উপার্জন কমতে থাকায় তারা কাজে ঢিলা দিতে থাকল। শ্রমশক্তির যে ঘাটতিটা ছিল, সেটা আরও বেড়ে গেল।

আগের বছরগুলোতে রাজনৈতিক প্রচার করে তাচাই মজুরি ব্যবস্থা

লাগু করা হয়েছিল। সক্রিয় শ্রমিকদের প্রশংসা করায় এবং যারা পিছিয়ে পড়া তাদের নিন্দা করায় আগে যে ফল পাওয়া গিয়েছিল, তা আর কাজ করছিল না। এখন মাও চিন্তাধারার প্রচারক মূলত স্থানীয় যুবক, তারা বয়স্ক এবং পড়শিদের পিছিয়ে পড়া আচরণ বা কাজের গাফিলতি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছিল না। তাচাই ব্যবস্থার জন্য দরকার ছিল চাষিদের এক উচ্চ নৈতিক বোধ। মানবিক মূল্যবোধ এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির যোগফলে যে অর্থনৈতিক যাদু তৈরি করতে পারে, সে ব্যাপারে মাও প্রচারক বা চাষি কারোরই তেমন বিশ্বাস অবশিষ্ট ছিল না। ১৯৭০ সাল নাগাদ উৎপাদনের অবনতি তাদের বিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছিল।

এই অবস্থায় চাষিরা ব্যক্তিগত আর্থিক উদ্যোগের দিকে বেশি ঝুঁকছিল। পাহাড়ের আশপাশের পতিত জমি সাফ করে বাড়তি ব্যক্তিগত সবজি চাষের জমি, অবসর সময়ে শুয়োর-মুরগি পালনে সাফল্য তাদের সমষ্টিগত চাষের আয়ের ঘাটতি পুষিয়ে দিচ্ছিল। সবজি, শুয়োর মুরগি বিক্রি বা ইট কারখানার জন্য ঘাস কেটে সরবরাহ করে যে নগদ পয়সা হাতে আসছিল, তা দিয়ে গ্রামের দোকান থেকে প্রায়শই কেনাকাটা সারতে পারছিল চাষিরা।

কিন্তু এসবে উৎপাদন টিমের প্রধানদের সমস্যা মিটছিল না। মাঠের কাজে চাষিদের মনোযোগ ফেরাতে তারা চাইছিল নতুন কোন একটা ব্যবস্থা। তাচাই ব্যবস্থা চাষিদের উৎসাহিত করছে না দেখতে পেয়ে জাতীয় প্রশাসন আকারে ইঙ্গিতে গ্রামগুলোকে বলছিল, যদি চাও তো পুরনো পিস-রেট ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারো। তাতে হয়তো উৎসাহহীন চাষিরা নিজেদের স্বার্থে খাটুনির দিকে মনোযোগ দেবে। কিন্তু অতীতে প্রকাশ্যে পিস-রেট ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী-পথ বলে তিরস্কার করা হয়েছিল। অনেক টিম-ক্যাডারদের মধ্যে ভয় ছিল, পিস-রেটে ফিরে গেলে কর্তারা আদর্শগত প্রশ্নে আবার ধরতে পারে। সমস্যাটার সমাধানের জন্য একটা নতুন নির্দেশ এল। নাকচ করা 'লিউ শাওচি পিস-রেট ব্যবস্থা'-র সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকা সত্ত্বেও নতুন পিস-রেট ব্যবস্থাকে 'মাও সেতুঙ পিস-রেট ব্যবস্থা' বলা হল। যাই হোক, ১৯৭৩ সালের গ্রীষ্মে চেন গ্রামের টিম-প্রধানেরা আবার পিস-রেটে ফিরে এল।

সত্তরের দশকে তাচাই ব্যবস্থা লাগু করতে যত ঝঞ্ঝাট হোক না কেন, লঙইয়ঙ পিস-রেট ব্যবস্থা পছন্দ করত না। তার মতে, ওই ব্যবস্থায় চাষিরা নিজের কথাই ভাবে, গ্রাম বা টিমের কথা ভাবে না। তার নিজের ৪ নং টিম ছিল গ্রামের আদর্শ টিম। সেখানে সে তাচাই ব্যবস্থা ধরে রাখতে চাইল। কিন্তু টিমের অন্যরা তার কথা শুনল না। ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে তারা পিস-রেট ফিরিয়ে আনার পক্ষে মত দিল।

প্রচার-অভিযানের উপদ্রব

ক'বছর আগেও চেন চাষিরা মাও চিন্তাধারা প্রচার-অভিযানের সময় পরার্থবাদ, সহযোগিতা ও আত্মত্যাগের ভিত্তিতে এক নৈতিক ব্যবস্থার মাওবাদী দর্শনের প্রতি টান অনুভব করত। ক্রমাগত সেই পরার্থবাদী সহযোগিতার প্রতি তাদের আস্থা কমছিল। মাওয়ের যেসব উদ্ধৃতি আগে চাষিদের মধ্যে এক সময় নৈতিক বাণীর মতো কাজ করত, তা ক্রমেই ব্যক্তিগত শত্রুতা আর কাউকে নাকাল করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। লিন পিয়াওয়ের ঘটনা, চাষিদের নিজস্ব অর্থনীতির নিশ্চল অবস্থা এবং পার্টির কৃষি সংক্রান্ত নীতিগুলোর কাণ্ডজ্ঞানহীন ডিগবাজির ফলে মাওয়ের পবিত্রতা এবং মাওবাদী নীতির প্রতি চাষিদের চূড়ান্ত বিশ্বাস বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিল। তাই আদর্শ আর মাওবাদী নৈতিকতার নামে হাজির করা পার্টির আবেদনগুলো চেন চাষিরা আর শুনতে চাইছিল না। তারা 'রাজনীতি'-র ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। গ্রামে সন্ধ্যায় পার্টির ক্লান্তিকর বক্তৃতা শুনতে আর তাদের ভালো লাগত না। সভায় না গিয়ে তারা বিকেলের পর ঘরে বিশ্রাম করা আর গৃহস্থালীর কাজে সময় দিতে চাইত। পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে উপার্জনের কাজেও তাদের উদ্বৃত্ত সময়ের চাহিদা বাড়ছিল। পিকিং থেকে নতুন কোন প্রচার-অভিযান এলেই চাষিরা গোঁ গোঁ করত। মাওয়ের স্ত্রী জিয়াঙ কিঙের সঙ্গে যুক্ত ডজনখানেক মডেল ফিল্ম কয়েক বছর যাবৎ বারংবার দেখানো হত। চাষিরা এগুলো দেখতে এত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, একজন চাষি রেগে গিয়ে মন্তব্য করেছিল : "যদি তুমি ওগুলো না দেখতে যাও, পরেরদিন মিটিংয়ে তোমাকে সমালোচনা করা হবে। ওরা বলবে এই ফিল্মগুলো দেখা দরকার, এগুলো চেয়ারম্যান মাওয়ের লাইন অধ্যয়ন করার মতোই উপকারি। অতএব প্রতি রাতে ওগুলো দেখার জন্য তোমাকে ঘর থেকে টেনে বের করা হবে।"

উত্যক্ত চেনরা ১৯৭২-এর শেষদিককার লিন-বিরোধী জাতীয় প্রচার-অভিযানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছিল না। এই নতুন প্রচার-অভিযানে লিন পিয়াও বেঁচে থাকাকালীন যেসব অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলোকে তাঁর প্রতিবিপ্লবী ক্ষতের দোষ হিসেবে চিহ্নিত করা হল। যেমন, লিনের সময় 'শস্য প্রধান অবলম্বন' নীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল; চাষিরা প্রকাশ্যেই খোঁটা দিয়ে বলত : "আমাদের উৎপাদন ভালো হয়নি লিন পিয়াওয়ের জন্য! তিনি আমাদের তরমুজ বা অন্য সবজি লাগাতে বারণ করেছিলেন। তিনি আমাদের মরণ চেয়েছিলেন!"

১৯৭৩ সালে লিন-বিরোধী প্রচার-অভিযান কোন এক অজ্ঞাত কারণে লিন ও কনফুসিয়াস বিরোধী প্রচার-অভিযানে রূপান্তরিত হল। শহর থেকে গ্রামে আসা যুবকেরাও এর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না। তারা বুঝতে পারল না, কীভাবে এক রহস্যজনক কায়দায় কনফুসিয়াস বিরোধিতার আড়ালে চৌ এনলাই এবং অন্য মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে নেতৃত্বের জঙ্গি শিবির (চারচক্রী)। কনফুসিয়াসকে কালিমালিপ্ত করে সেই অখাদ্য রচনাগুলো যখন গ্রামের সাধারণ সভায় পাঠ করা হল, ক্যাডার এবং কর্মীরা ভালো ছেলের মতো মাথা নেড়ে সায় দিল। অথচ সাধারণভাবে কেউই রোজকার জীবনে কনফুসিয়াসের সামন্ততান্ত্রিক ভাবনার প্রকাশ কীভাবে ঘটছে বুঝতে পারেনি। কিন্তু এক যুবক-চাষি যখন বয়স্কদের কাছ থেকে সরাসরি কনফুসিয়াসের লেখা সম্পর্কে জানতে পারল, সে অবাক হয়ে গেল। এই প্রচার-অভিযান চেন চাষিদের কাছে একঘেয়ে 'ফাঁকা রাজনীতি'-র এক চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে প্রতিপন্ন হল।

এরপরেই ১৯৭৪-৭৫ সালে আসা পার্টির 'লাইন শিক্ষা প্রচার-অভিযান' আরও কম জনপ্রিয় হল। পিকিংয়ে জঙ্গি নেতৃত্ব পার্টির মাথায় চড়ে বসেছিল। সেই নেতারা দেখতে পেল, চাষিরা নিজেদের ব্যক্তিগত উপার্জনের উদ্যোগ থেকে উৎপাদন টিমের সমষ্টিগত চাষের দিকে মনোযোগ ফেরাচ্ছে না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কেবল গুয়াঙদঙ প্রদেশেই ১,২০,০০০ ক্যাডারের ওয়ার্কটিম পাঠানো হল। চেন গ্রামে গিয়ে ওয়ার্কটিমের ক্যাডাররা চাষিদের ব্যক্তিগত জমি মেপে প্রত্যেক পরিবারের গোড়ায় পাওয়া ব্যক্তিগত জমির বাড়তি অংশ কেড়ে নিল। কোন কোন চাষি দু'ডজন বা তারও বেশি হাঁস পালন করত, দশটা হাঁস রেখে বাকিটা বাজেয়াপ্ত করা হল। পালিত মুরগির সংখ্যাও কাটছাঁট করা হল। দিনেরবেলা যারা টিমের খেতের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ঘাস কাটতে যেত, তাদের ওপর পাঁচ ইউয়ান ফাইন করা হল। এসবে চাষিরা ক্ষুব্ধ হল বটে। কিন্তু পার্টির নীতিগুলো যেমন কিছুদিন অন্তর পাল্টে যেত, সেইরকম রদবদলের আশায় তারা কোমর কষে অপেক্ষা করতে থাকল।

নতুন প্রজন্ম

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি চাষি সমাজের নবীনতর প্রজন্মের অসন্তোষ বাড়ছিল। এক প্রেরিত যুবক বলেছিল : চাষিদের মধ্যে যারা প্রবীণতর

তারা ততটা অসন্তুষ্ট নয়। নবীনতররা বেশ কয়েক বছর স্কুলে পড়াশোনা করেছে। তারা আর মাঠে কাজ করতে চায় না। কাজটা তাদের কাছে পরিশ্রমসাধ্য এবং এই ধরনের জীবন তাদের কাছে অর্থহীন। তারা মনে করে, তাদের যোগ্যতার কোন দাম নেই, কারণ চাষের কাজে মেধার তেমন দরকার পড়ে না। তারা ফ্যাকট্রি, দোকান অথবা সরকারি বিভাগে কাজ করার স্বপ্ন দেখে।" তাদের মায়েরা কোনদিন কাউন্টি রাজধানী চোখে দেখেনি, কিন্তু তারা শহর থেকে আসা যুবকদের সঙ্গে ক্যান্টন পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। এক একবার তারা শহর থেকে ঘুরে আসে আর তাদের চিন্তাভাবনা আরও পাকিয়ে যায়; চাষের খেত ছেড়ে বেরোনোর আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যায়। চেন গ্রামটা তখন এই যুবকদের কাছে একটা বদ্ধ জলাশয়ের মতো মনে হয়।

বিপ্লবের আগের কঠিন জীবন তারা ভোগ করেনি, তাই পুরনোদের মতো এই জীবনটাকে আশির্বাদ মনে হয় না। পার্টি নিয়মমাফিক অধিবেশনে 'অতীতের তিক্ততাকে স্মরণ করো এবং বর্তমানের মধুরতাকে অনুভব করো' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে চাষিদের মনে একটা উপলব্ধি তৈরি করে দিতে চাইত। কিন্তু এক প্রেরিত যুবক বিষয়টা এইভাবে বলেছিল : এইসব গল্প যুবকদের কাছে এক অবাস্তব সিনেমা দেখার মতো লাগত। তারা এগুলো নিয়ে হাসাহাসি করত আর যে প্রবীণেরা এইসব গল্প বলত, তাদের নিয়ে ঠাট্টা করত। ... বেশিরভাগ যুবকই এগুলো বিশ্বাস করত না। এই অতীতের অভিজ্ঞতা তাদের কখনই হয়নি, সেগুলো এতটা খারাপ ছিল বলে তাদের মনে হত না। তারা মনে করত, ওইভাবে সবসময় পিছনে তাকানোর দরকার নেই, পুরনোর সঙ্গে নতুন সমাজের সবসময় তুলনা করারও দরকার পড়ে না, বর্তমানকে জরিপ করার জন্য অতীতকে ব্যবহার করা উচিত নয়।"

ষাটের দশকে যারা কৈশোরে ছিল, সেই দাদাদের সঙ্গেও এই নবীনদের একটা বোধের ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। তিরিশের কাছাকাছি বয়সের এক ডেপুটি টিম-প্রধান অভিযোগ করে বলছিল : "এইসব ছাত্রেরা! তুমি ওদের খেতে গিয়ে আগাছা সাফ করতে বলো, ওদের দুঃসাহস তুমি ভাবতেও পারবে না, ওরা পালিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়বে। কী সাহস ওদের! আমাদের সময়কার ছেলেরা কখনই এত অলস ছিল না!"

এই প্রাপ্তবয়স্ক যুবকেরা নিজেদের কৈশোরে দেখেছে, ষাটের দশকের মধ্যভাগে গ্রামের অর্থনীতি তেজি হয়ে ছিল, যেন এক উন্নততর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে তা এগোচ্ছিল। এমনকী খারাপ শ্রেণী থেকে আসা লোকেরাও বলেছিল আমাদের, তারা পার্টি ও মাওকে বিশ্বাস করত এবং প্রত্যেকেই সমষ্টির জন্য কঠোর শ্রম করতে চেষ্টা করত। কিন্তু পঞ্চাশের শেষের দিকে বা ষাটের গোড়ায় যারা জন্মেছিল, তারা কৈশোরে দেখেছে সত্তরের অর্থনৈতিক হতাশজনক অবস্থা আর বিভ্রান্তিকর রাজনীতি। এই সদ্য যুবকেরা বাবামায়ের কাছে সবসময় পকেটমানি চাইত এবং সমষ্টিগত খেতের কাজে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এগিয়ে আসতে না চাওয়ায় বাবামায়েরাও বিরক্ত হত। এই নতুন প্রজন্মের সঠিক ও ভুল সম্পর্কে ধারণা আগের প্রজন্মের লোকেদের উত্তেজিত করে তুলত। গ্রামে আগে ছিঁচকে চুরি অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তা ক্রমশ বাড়তে লাগল। যৌথচাষ থেকে পাওয়া খাবারদাবারে নবীন চাষিদের রুচি ছিল না। তারা পড়শির হাঁস-মুরগি চুরি করে পাহাড়ে গিয়ে ভোজ লাগাত, চুরি করতে গিয়ে অনেকে ধরাও পড়ত। লঙইয়ঙ এই নবীন প্রজন্মকে একেবারেই দেখতে পারত না। তার সম্পর্কে এক নবীন চাষি বলেছিল : "লঙইয়ঙ লোকটা সবসময় খারাপ মেজাজে থাকত। সে নিজেকে একজন রক্ষাকর্তা মনে করত। ভাবা যায়! আখের খেতে কোন বাচ্চা একটা আখের টুকরো চিবোচ্ছে দেখলে সে সহ্য করতে পারত না। সে তাদের খুব বকত আর পরিবারকে ফাইন করে দিত। আমরা ওকে আসতে দেখলেই অন্য রাস্তায় হাঁটতাম ... ওর মুখোমুখি হতে চাইতাম না।" একজন প্রেরিত যুবক বলেছিল : "আগের প্রজন্মের কাছে লঙইয়ঙের কঠোর শ্রমের আবেদনের একটা নৈতিক মূল্য ছিল। তারা নিজেরা এগোতে না চাইলেও লঙইয়ঙের কথা সঠিক বলেই মনে করত। কিন্তু নবীন প্রজন্ম শ্রমকে এত উচ্চ মূল্য দিতে চাইত না আর সেই কারণেই লঙইয়ঙের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ছিল না।"

এই নবীনেরা বোকাকে পছন্দ করত। তারা মনে করত, বোকা তাদের বোঝে। চেন গ্রামের 'স্থানীয় রাজা'-র মতো লঙইয়ঙ নিজের মারমুখো ভঙ্গিতে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করত; বোকা তাদের সঙ্গে গল্প করত এবং কখনও অলসভাবে কাটানো নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিংফাও অনেক নরম হয়ে গিয়েছিল। এক দশক আগেও সে বাঘের মতো ভয়ঙ্কর ছিল। সে আর কারোর সঙ্গে ঝগড়া করত না, এমনকী লঙইয়ঙের সঙ্গেও নয়। সে গ্রামের যুব-বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিল। একবছর সে যুব দিবসে যুবকদের নিজেদের পরিবারের খেতেও কাজে যেতে বারণ করে একটা ভাষণ দিয়েছিল : "তোমরা যুবকেরা বাস্কেটবল খেলতে যাবে। বেশি কঠিন শ্রম করতে যেও না। যদি তোমরা বেশি উপার্জন করো, বেশি দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট কিনতে পারবে। অর্থ না থাকলে কম দামি সিগারেট পাবে। যদি তোমরা ২০ সেন্ট দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে খাও, তোমাদের ফুসফুস কালো হয়ে যাবে। ৫০ সেন্টের সিগারেট খেলেও ফুসফুস একইরকম কালো হবে। তাহলে কেনইবা আজ কাজ করতে যাবে?"

ক্যাডারদের বিশেষ সুবিধাভোগ এবং নেতাদের দলবাজি

কিংফা নিজেও ক্যাডার হিসেবে ধার্য একশ দিনের কায়িক শ্রমে ফাঁকি মারত। তাকে কিছু কাজ দিয়ে নিয়মিত কাউন্টিতে এবং মাঝেমধ্যে ক্যান্টনেও পাঠানো হত। সেই সুযোগে সে আলগাভাবে চলার সুযোগ পেত। হঙকঙ থেকে তার বোনের পাঠানো ২০০০ ইউয়ান কাজে লাগিয়ে সে একটা নতুন বাড়ি করল। চেন গ্রামের অন্যতম উৎকৃষ্ট এই বাড়ির মালমশলার জন্য সে তার প্রেরক হিসেবে যোগাযোগগুলোকে কাজে লাগাল। শহরের গুদামগুলোর দায়িত্বে থাকা লোকেদের তুষ্ট করার জন্য চেন গ্রাম থেকে চিনি ও শাকসবজি কিনে নিয়ে গেল। অতীতে 'স্থানীয় রাজা' থাকাকালীন আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে ভোজ খাওয়ার অভ্যাসটা সে ছাড়েনি। এব্যাপারে সে একটু বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। খারাপ শ্রেণী থেকে আসা এক যুবক-চাষি বলেছিল : "আমি যখন হঙকঙে পালিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম, বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ আমার কাছে ঘেঁষত না। সামান্য কয়েকজন ঘনিষ্ঠ যারা সাহস করে আসত, তাদের জন্য এক রাতে আমি কুকুরের মাংসের ভোজ (গুয়াঙদঙ প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের উপাদেয় খাদ্য) দিলাম এবং কিংফাকেও আমন্ত্রণ জানালাম। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে সে উপস্থিত হল! খাবারের গন্ধ পেলে সে যে কারোর ডাকে সঙ্গে বসে যেত।"

বিশেষ সুবিধা নেওয়া, কেবল কিংফাই নয়, যে কোন ক্যাডারই সেটাকে তার পদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করত। অতীতে কোন মিটিং থাকলে, সেটা সেরে ক্যাডাররা দ্রুত খেতের কাজে ফিরে যেত। 'কিন্তু এখন তা চলে না' — বলেছিল এক প্রাক্তন ক্যাডার। "দেরিতে মিটিং শুরু হত, আদতে বিকেলে মাত্র দু'এক ঘন্টার মিটিং, অথচ সকলে খুবই হালকা মেজাজে চলত, যেন একটা ছুটির মেজাজ। মিটিং করলেই ওয়ার্কপয়েন্ট, খাওয়াদাওয়া, একটা অবসরের দিন।" কিছু ক্যাডার তো নিজেদের পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি তৈরি করে নিল। পুরনো

বাড়ির মাটির দেওয়াল — যেটা সারের মধ্যে ব্যবহৃত হত — দিয়ে তার বিনিময়ে টিম ও ব্রিগেড থেকে বাড়ি তৈরির কিছু শ্রম সরবরাহ করা হত। এব্যাপারে চাষিদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ক্যাডাররা মাথা ঘামাত না। গ্রামে এসবে নজরদারি করার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। চার সংশোধন কর্মসূচির সময় যে গরিব ও নিম্ন-মধ্য চাষি সমিতি একটা নজর রাখার সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল, তাতে ওয়ার্কটিমগুলো গরিব চাষিদের প্রতিনিধিপদ দিয়েছিল। নিচেরতলা থেকে এই প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পদের সুবাদে সেই প্রতিনিধি প্রত্যেক টিমের ম্যানেজমেন্ট কমিটির আলোচনায় অংশ নেওয়ার অনুমতি পেত। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিগেড স্তরে বছরে দু'বার এই সমিতির মিটিং বসত এবং তাতে সভাপতিত্ব করত পার্টি সেক্রেটারি জিনঈ। এগুলো ছিল নতুন চীনে বিপ্লবের প্রতি নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই, আদতে তার কোন ভূমিকা অবশিষ্ট ছিল না। চার সংশোধন কর্মসূচির এক দশক পরে তার ভয়াবহ স্মৃতিটাও ফিকে হয়ে গিয়েছিল। এক শহুরে যুবক বলেছিল : "ক্যাডাররা জনগণকে ভয় পায় না আর জনগণও ক্যাডারদের ভয় পায় না। ক্যাডাররা ভাবত, চালিয়ে যাব, আমার পদে কি আর ফিরে আসব না? বিপরীতে জনগণ ভাবত, আমাদের ধোঁকা দিচ্ছ, ঠিক আছে। একটা প্রচার-অভিযান আসুক, তখন টের পাবে। যখন আমি চার সংশোধন কর্মসূচির সময় প্রথমে গ্রামে গিয়েছিলাম, সকলে সকলকে ভয় পেত। ক্যাডাররা জনগণকে ভয় পেত এবং জনগণও ভয় পেত যে ক্যাডাররা প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু এখন সকলের অভিজ্ঞতা হয়েছে, কেউ আর ভয় পায় না। সকলেরই চামড়া মোটা হয়ে গেছে।"

যে যুবক ক্যাডাররা চার সংশোধন কর্মসূচি দেখেনি, তাদের কেউ কেউ আরও বেপরোয়া। এদের মধ্যে একজন ছিল পার্টির ডেপুটি সেক্রেটারি বোকা, সে তার প্রথম সন্তান হওয়ার পর বাড়িটা পিছনের দিকে বাড়িয়ে আরও কয়েকটা ঘর তৈরি করে নিল। এধরনের দখলদারির ব্যাপারে ব্রিগেডের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। লঙইয়ঙ বোকার পাড়ায় এসে খুব চেঁচামেচি করল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। ব্রিগেডের ক্যাডারদের মধ্যে সকলের কাছে বরাবর দুর্নীতিহীন বলে পরিচিত ছিল অযোগ্য পার্টি সেক্রেটারি জিনঈ। লঙইয়ঙ নিজে এত সততা দেখালেও যুবক-চাষিরা তার ছেলেকে নিয়ে গুঞ্জন তুলেছিল। ছেলেটি জুনিয়র হাইস্কুল গ্রাজুয়েট হিসেবে কমিউন হাই স্কুলে শিক্ষকতা করত। যুবকেরা সন্দেহ করত, দু'বছরের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাবার প্রভাব খাটিয়ে সে চাকরিটা আদায় করেছিল। এটাও লোকে বলাবলি করত, বিদেশি দেঙের কাছ থেকে দামি ওষুধ উপহার নিয়ে লঙইয়ঙ তাকে বিদেশে যাওয়ার ভিসার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। আরও প্রচার ছিল, তার বাড়িটা বাড়ানোর জন্য লঙইয়ঙ সরকারি নিম্ন-মূল্যে কাঠের পাটাতন কিনেছিল। এরকম বেআইনি সস্তাদরে কাঠের পাটাতন কেনার ব্যাপারটা গ্রামে চালু ছিল। কিন্তু লঙইয়ঙ যেভাবে নিজেকে দুর্নীতিহীন ক্যাডার হিসেবে দেখাতে চাইত, তাতে সে কিছুটা রসিকতার পাত্র হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, ক্যাডারদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক অন্তর্ঘাতের ঘটনাও গ্রামে বেড়ে উঠেছিল। এক ওয়ার্কপয়েন্ট রেকর্ডার কয়েকজন চাষির সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করল, পরেরদিন সকালে দেখা গেল রাতে তার হাঁসগুলোর গলা কে যেন মুচড়ে দিয়ে চলে গেছে। জিনঈ পরিচ্ছন্নতার জন্য গ্রামের সমস্ত শুকরছানাগুলোকে বাইরে ছেড়ে না রেখে খোঁয়াড়ে আটকে রাখার নির্দেশ দেওয়ার পর তার শুয়োরটাকে বিষ খাইয়ে কে যেন মেরে ফেলল। কিংফাকে জনসমক্ষে আবার হেয় করার জন্য লঙইয়ঙ তাকে সবচেয়ে কম জনপ্রিয় জননিরাপত্তা প্রধানের পদ নিতে বলল। সে এরপরেই দেখল, তার ব্যক্তিগত জমিতে কাঁটা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। মর্মাহত কিংফা ওই পদের জন্য বিবেচনাধীন তার নামটা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

লঙইয়ঙ অন্যের বিরোধিতা সহ্য করতে পারত না। কেউ প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলে সে যে কোনপ্রকারে তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিত। সে ছিল গ্রামের ঝানু রাজনীতিবিদ। গ্রামের মহিলা সমিতির প্রধান ছিল লিলৌয়ের মেয়ে পুমি। তিরিশের কাছাকাছি বয়সের এই মেয়েটি তার সময়কার একমাত্র হাইস্কুল গ্রাজুয়েট। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে তার চেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রশংসিত মেয়ে বোধহয় আর ছিল না। মহিলা সমিতির নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিগেডের কোন বিষয়ে তার তেমন প্রভাব ছিল না। এক চেন মহিলা বলেছিল : "মহিলা সমিতিতে নেত্রী ছাড়া দ্বিতীয় সদস্য ছিল না। ব্রিগেড স্তরের মহিলাদের কমিটি কেবল মেয়েদের পরিবার পরিকল্পনায় অংশ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্যই থাকত; তারা মহিলাদের মাও অধ্যয়ন করা এবং বীজতলা নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপারেও পরামর্শ দিত। এছাড়া কমিটি একটা 'গোপন' কাজও করত, যুবতীদের যৌনতা নিয়ে বলত সমাজতান্ত্রিক উপায়ে, তাদের গ্রামে থাকা এবং বিয়ে করে অন্যত্র না চলে যাওয়ার জন্য বোঝাত ... মহিলা সমিতির প্রধানের বিশেষ দায়িত্ব ছিল, গ্রামে ক্যাডারদের মিটিংয়ের জন্য রান্না করে দেওয়া এবং টেবিলে পরিবেশন করা।" পুমি অবশ্য একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে গ্রামের ব্রিগেড ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে ঢুকতে পেরে তার উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছিল এবং লঙইয়ঙের সঙ্গে মিটিংয়ে টক্কর নিত। লঙইয়ঙ কায়দা করে তিন নং টিম-প্রধানের এক অনভিজ্ঞ, অপরিচিত ১৯ বছরের মেয়েকে পুমির জায়গায় বসাতে চাইল। মেয়েটির দিদির সঙ্গে লঙইয়ঙের ছেলের বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল এবং ওদের বাবাকে কিংফার পুরনো টিমের প্রধান করার কথা চলছিল। আসলে লঙইয়ঙ পার্টির মধ্যে নিজের একটা গোষ্ঠীগত ভিত্তি গড়ে তুলতে চাইছিল। সে কমিউনের সঙ্গে যোগসাজশ করে বোকাকে ওপরতলায় পাঠাতে চাইল। ১৯৭৬-৭৭ সালে বোকাকে কমিউনের প্রশাসনে পূর্ণসময়ের দায়িত্ব দেওয়া হল। ফলে বোকাকে খুশি করার মাধ্যমে সে গ্রামে তার নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে ফেলল। একইরকমভাবে কিংফাকে পাঠানো হল কমিউনের গুদামরক্ষকের পদে। কিংফা এতে কিছুই মনে করল না। বরং কমিউন শহরে রোজকার দু'ঘন্টার হালকা কাজ পেয়ে সে খুশিই হল।

মাওয়ের পর

মাওয়ের মৃত্যুর আগে গ্রামবাসীরা ভাবত, চেয়ারম্যান মাওয়ের পরের ধাপের নেতৃত্বের মধ্যে উত্তরাধিকারের জন্য একটা বৈরিতা পার্টিতে রয়েছে। ১৯৭৬-এর গোড়ায় দক্ষিণের কিছু বিক্ষুব্ধ এয়ারফোর্স অফিসার আকাশপথে একটা প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয় কমিউনে; এতে জঙ্গি (পরে যাদের চারচক্রী বলা হয়েছিল) গোষ্ঠীর সমালোচনা করে বিরোধী মধ্যপন্থী চৌ এনলাই ও দেঙ শিয়াওপিঙকে সমর্থন করা হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে মাও মারা যাওয়ার ঘোষণা হতেই চেনরা আন্দাজ করল, এবার গ্রামের ব্যাপারে নতুন কোন পরিবর্তন হতে চলেছে। জঙ্গি গোষ্ঠীর গ্রেপ্তারি ছাড়া স্বল্পকালের মধ্যে তেমন কিছু ঘটল না। হুয়া গুয়োফেঙ চেয়ারম্যান হওয়ায় কী ঘটতে পারে, পার্টি-আমলারা নিশ্চিত ছিল না। মাস চারেক পর 'তাচাই থেকে শেখো জাতীয় সম্মেলন'-এ জঙ্গি ভাবটা বজায় থাকল।

চারচক্রীদের পতনের পরই পার্টি একটা বাম মোড় নিল। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কোটার অতিরিক্ত আখের উৎপাদনের জন্য চালু ২৫% বোনাসের অনুমোদন তুলে নিল। চিনি উৎপাদনকারী জেলাগুলোতে আখের চাষ আপনাআপনি কমে গেল। প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে কর্তারা প্রচারে নামল যাতে প্রাদেশিক চিনির সরবরাহ কমে না যায়। ১৯৭৮-এর বসন্তে সেই কর্তারা ভোল পাল্টে আবার কোটা-অতিরিক্ত আখে বোনাস ফিরিয়ে

আনল। চেন গ্রামে এর আগে শ্লোগান উঠেছিল : "সংশোধনবাদী [কিউবান] আখের বিরোধিতা করো; আমদানিকৃত চিনি চাই না।" এক গ্রামবাসী স্মৃতিচারণ করেছিল : "প্রত্যেককেই আখ লাগাতে হল, এমনকী বাজার-শহরকেও; কমিউন প্রশাসনকেও ছাড় দেওয়া হল না! কমিউনের নিজস্ব জমি না থাকায় চেন গ্রামের ২০ একর জমি ধার নেওয়া হল। এমনকী ধানের খেত বদলে আখচাষের জন্য নেওয়া হল; বড়ো গাছগুলোও কাটা পড়ল। রাষ্ট্র সবসময় বলত, গাছ কাটবে না, দেশটা সবুজ থাকুক। কিন্তু তারাই এখন গাছ কাটাচ্ছে! ... আমরা রাতেও আখ লাগাতাম!"

চিনির এই খুদে উল্লম্ফনের মধ্যেই একেবারে ভিন্ন কিছু নীতি আসার সংকেত পাওয়া গেল। মাও সেতুঙ মারা যাওয়ার পর গ্রামের দোকানটাতে বাইসাইকেল, ঘড়ি ইত্যাদি দুর্লভ জিনিসপত্র বোঝাই হতে লাগল। রাষ্ট্র চাইছিল, বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে ক্ষুব্ধ চাষিদের মন জয় করতে। দেঙ শিয়াওপিঙ এবং তাঁর আধুনিক-মনস্ক সঙ্গীরা ১৯৭৮-এ সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান এল : "অর্থনীতির অগ্রাধিকার, রাজনীতির অগ্রাধিকার আর নয়"। পিকিং থেকে যে রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান আসত, তা স্তিমিত হল; গ্রামে চাষিদের রাতের মিটিংয়ে ডাকাডাকি কমে গেল। শ্রেণীসংগ্রামের বদলে উৎপাদনের উদ্যোগ ভরকেন্দ্রে চলে এল। ১৯৭৯-র গোড়ার দিকে চার খারাপ শ্রেণীর লেবেলটা সরিয়ে নেওয়া হল। ১৯৭৮ সালের শেষে চীনের গ্রামাঞ্চলে পূর্বতন জমিদার ও ধনী চাষি — যাদের ওপর চার খারাপ শ্রেণীর লেবেল সাঁটা ছিল — সংখ্যায় ছিল চল্লিশ লক্ষাধিক। এক বছরের মধ্যে তাদের ৯৯ শতাংশের ওপর থেকে লেবেলটা সরিয়ে ফেলা হল; পড়ে রইল সংশোধনের অযোগ্য মাত্র ৫০,০০০ খারাপ শ্রেণীর লোক (বেজিং রিভিউ, ২১ জানুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ১৪)। গ্রামে উৎপাদন টিমকে তাদের পছন্দসই লাভজনক ফসল ফলাতে নির্দেশ দিল পিকিং। রাষ্ট্রীয় ভাঁড়ারের জন্য শস্যের সংগ্রহ-মূল্য বাড়ানো হল। শহরের বাজারে খেতের উৎপন্ন সামগ্রী যাতে বেশি আসে, তার জন্য চাষিদের ব্যক্তিগত জমিতে চাষ ও পারিবারিক পশুপালনে উৎসাহিত করা হল। সর্বোপরি, টিমগুলোকে আশ্বস্ত করা হল, গ্রামীণ নীতিগুলো দীর্ঘমেয়াদিভাবে অপরিবর্তিত থাকবে।

লঙইয়ঙ এবং ব্রিগেড কমিটি এবার চাষের বৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্য নতুন বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকল। নতুন ফলের বাগান তৈরি করা হল; আশিটা মৌচাক সংরক্ষণ করা হল। এক হাজার ইউয়ান করে দাম, এক বিশেষ জাতের হরিণ, একপাল কিনে এনে বাণিজ্যিকভাবে পালন করা হল। ওই হরিণের শিং থেকে অত্যন্ত দামি ওষুধ তৈরি হত। এই তড়িঘড়ি বিন্যোগের জন্য লঙইয়ঙ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করল। ফলে টিমের ওপর তা মেটানোর বাড়তি চাপ পড়ল। নতুন শস্যগুদাম ও যন্ত্রপাতির জন্যও বিনিয়োগ করল টিমগুলো। ফলে টিমের হাতে অর্থের অভাব দেখা দিল, চাষিদের বার্ষিক মজুরি মেটানোর ক্ষমতা কমে গেল। অসন্তুষ্ট চাষিরা কাজে ঢিলা দিল।

নতুন সংস্কার চাষিদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে পারল না। ১৯৭৮ সাল নাগাদ চাষিরা তখনও আগের নৈতিক পিছু হটার ধাক্কা সামলাতে পারেনি; বর্তমান পরিস্থিতিও তাদের কাছে সুখকর নয় আর ভবিষ্যত সম্পর্কেও তারা নিরাশ।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি যে মাও চিন্তাধারার আন্দোলন যাদুর মতো চাষিদের উদ্বুদ্ধ করে সকলের জন্য আত্মত্যাগ আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটিয়েছিল, ১৯৭০-এর মাঝামাঝি সেই চাষিরাই আর বিপ্লবের জন্য শস্য দিতে চাইল না। যে পার্টির রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক লাইন বদলে যাচ্ছিল, যে পার্টির উন্নততর জীবনের আশ্বাস ফাঁকা বুলির মতো শোনাচ্ছিল, যে পার্টির রাজনৈতিক চাপে গ্রামের অর্থনৈতিক বিকাশের অবনতি ঘটছিল, তার চাপে চাষিসমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

সত্তরের শেষের অপ্রীতিকর উত্তরাধিকার একটা হতাশজনক অবিশ্বাসের বাতাবরণ টিকিয়ে রেখেছিল, ষাটের দশকের গোড়াতে গভীর মন্দার সময়ও তা ছিল না। পঞ্চাশের দশকে মাও সেতুঙ এবং পার্টি যে স্বপ্নে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল; চার সংশোধন কর্মসূচির সময়ও যা আবার ফিরে এসেছিল, সেটা উধাও হয়ে গেল। 'নতুন চীন' এবং উন্নততর সমাজ গড়ার সুযোগটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটার পর একটা অকার্যকর অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে পার্টি ১৯৬০-এর দশকের শেষ থেকে ১৯৭০-এর শেষভাগ পর্যন্ত চাষিদের ওপর আরোপ করেছিল। নিচেরতলার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে, কখনও বা ক্যাডার বা জনগণকে পার্টি লাইনে আস্থাশীল রাখার জন্য বিভিন্ন সংগ্রামী প্রচার-অভিযানকে কাজে লাগানো হয়েছিল। তাতে সাময়িকভাবে ক্যাডার বা সাধারণ চাষি কিছুটা সতর্ক হয়েছিল বটে। কিন্তু তাদের মধ্যে পুরনো ও নতুন ক্ষোভ জমা হয়ে থাকল, তারা রাজনীতির রণনৈতিক কায়দাটা শিখে নিল। তারা শিখল, কীভাবে মাওবাদী বাগাড়ম্বর দিয়ে এবং সঠিকতার পক্ষে লড়াইয়ের নামে বিরোধীদের শায়েস্তা করা যায়। ওইসব ওপরতলা থেকে আসা প্রচার-অভিযান গ্রামে নতুন কোন একতা তৈরি না করে দলাদলি, পরস্পরের মধ্যে লড়াই আর স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির এক চরম পরিবেশ রচনা করল। যে রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর দিয়ে গ্রামের অল্পসংখ্যক চিহ্নিত লোককে মুগুরপেটা করে বেশিরভাগকে বাগে আনা হত, শেষপর্যন্ত চাষিসমাজ সেই রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরেই একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল।

নতুন যুগ : দেশত্যাগের হিড়িক

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় দেঙ শিয়াওপিঙ এবং তাঁর সঙ্গীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে হুয়া গুয়োফেঙকে শেষ ধাক্কা দিয়ে মাও যুগের অবসান ঘটালেন।

১৯৬৬-৬৮ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় থেকে এক দশকে শহর থেকে আসা যুবকদের বাদ দিয়ে আরও জনাদশেক চেন যুবক গ্রাম থেকে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হঙকঙ গিয়েছিল। ১৯৭৯-এর বসন্তের একদিন কাউন্টি জেলে গাদাগাদি অবস্থার বিরুদ্ধে বন্দীরা বিদ্রোহ করল। জেলে বন্দীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে কর্তৃপক্ষ হঙকঙে পালাতে চাওয়া যুবকদের মুক্ত করে দিল। একটা গুজব চেন গ্রাম এবং অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল, সরকার হঙকঙে যেতে আর বাধা দিচ্ছে না। সেই সন্ধ্যায় দলে দলে ছেলেরা চেন গ্রাম ছেড়ে আলো ঝলমল সুদূরের পানে নগদ উপার্জনের আশায় বেরিয়ে পড়ল। দলে দলে সব হঙকঙ দৌড়চ্ছে, যেন একটা দাঙ্গা লেগেছে! কাউন্টির সমস্ত গ্রাম থেকে সীমান্তে ধেয়ে আসা যুবকদের ভিড়ে সীমান্তরক্ষীরা হারিয়ে গেল। অল্পসংখ্যক যাদের ওরা গ্রেপ্তার করল, তাদের ফের সীমান্ত টপকানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল। রাতের পর রাত পনেরো-ষোল বছরের ছেলেমেয়েরা বাবামায়ের আশির্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল। মে থেকে অক্টোবর ১৯৭৯, কয়েক ডজন যুবতী এবং ডজন দুয়েক বিবাহিত পুরুষ সহ প্রায় দু'শ চেনবাসী গ্রাম ছেড়ে সীমান্ত পার হয়ে গেল। গ্রামে আর সমর্থ জোয়ান তেমন অবশিষ্ট রইল না। ১৯৮০ সালে হঙকঙ সরকার নতুন অভিবাসন থামাতে পরিচয়পত্র দেওয়া বন্ধ করল এবং পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে কাজে নিলে মালিকদের মোটা অঙ্কের ফাইন করতে শুরু করল। চেন গ্রাম থেকে অভিবাসনের স্রোত থামল।

যুবকদের গ্রাম ছাড়ার হিড়িকে লঙইয়ঙের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ডুবে গেল। ব্রিগেড স্তরের শিল্পোদ্যোগগুলো পরিচালনার যোগ্য লোকের অভাব

দেখা দিল। সেই গ্রীষ্মে দেনার দায়ে অডিটোরিয়াম রাষ্ট্রের কাছে বন্ধক রাখতে হল। লঙইয়ঙ প্রথমে পালিয়ে যাওয়া যুবকদের পরিবারগুলোকে শাসিয়েছিল, কেউ কর্ণপাত করেনি। অবশেষে তার নিজের দুই ছেলে যখন হঙকঙে চলে গেল, সে একেবারে দমে গেল।

পার্টি সেক্রেটারি অযোগ্য জিনঈর পক্ষে ব্রিগেডের এই শোচনীয় অবস্থায় হাল ধরা সম্ভব ছিল না। বোকা হয়ত পারত। কিন্তু সে কমিউনের কৃষি যন্ত্রপাতি বিভাগে ডাইরেক্টর পদে কাজ করছিল। সে কমিউনের নতুন চাকরি ছেড়ে গ্রামের চাষিজীবনে ফিরতে চাইছিল না। কমিউন নেতৃত্ব এবং চেন গ্রামের পার্টি–শাখা কিংফার কথা ভাবল, তাদের দরকার ছিল একটা শক্তপোক্ত পার্টি সেক্রেটারি। কিন্তু পনেরো বছর আগে সে লঙইয়ঙের কাছে ক্ষমতার লড়াইয়ে হেরে গিয়েছিল, বারো বছর আগে গোয়ালঘরে কারাবাস, পিটুনি সবই তার জুটেছিল। এখন চেন গ্রামের বেশিরভাগ সদস্য সেই কিংফাকেই চাইল। লঙইয়ঙ নেতৃত্বের জন্য আর একবার লড়তে চাইল বটে। কিন্তু সময়টা পাল্টে গিয়েছিল, কিংফা না চাইতেই তার কোলের ওপর ক্ষমতা এসে ধরা দিল।

যৌথ মালিকানা বাতিল

১৯৫০–এর দশকের মাঝামাঝি চীনের পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে একটা তর্ক হয়েছিল। একদিকে ছিলেন লিউ শাওচির মতো নেতারা, তাঁরা বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি অঢেল পাওয়া যাবে না এবং কৃষি শ্রম–নিবিড় থেকে যাবে, ততক্ষণ যৌথ মালিকানার পথে ধীরে এগোতে হবে এবং চাষিরা নিজেদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিখণ্ডে চাষ করবে। বিপরীত মত ছিল মাও সেতুঙের। তিনি বলেছিলেন, কৃষির মেকানাইজেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা যাবে না; চাষিদের সমর্থন আদায় করে দ্রুত যৌথ মালিকানার দিকে যেতে হবে এবং জমি ও শ্রমের দক্ষতর বৃহদায়তন সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদন এগিয়ে যাবে। মাওয়ের পথ অনুসরণ করে ১৯৫৫–৫৬ সাল নাগাদ যৌথ মালিকানার ভরা জোয়ার এসেছিল চীনের গ্রামাঞ্চলে।

চেন গ্রামের মতোই চীনের বিরাট গ্রামাঞ্চলে ১৯৭০–এর দশকে কৃষিতে ধাক্কা এল, তার সঙ্গে চলল রাজনৈতিক ডামাডোল। বছর বারো আগে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাগাড়ম্বর ও অত্যুক্তির সময়, কিংফাকে 'দুই নৌকায় পা দিয়ে [পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র] চলা'র জন্য সমালোচনা করা হয়েছিল। সে অবৈধভাবে হঙকঙে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। এখন রাষ্ট্র তাকে যে পথে চলার নির্দেশ দিল, মোটামুটি সেই পথে হেঁটেই অতীতে সে শাস্তি পেয়েছিল। ১৯৭০–এর দশকের শেষদিকে টিম ও ব্রিগেড ক্যাডারদের উৎসাহদান সত্ত্বেও গ্রামের উৎপাদন ঝিমিয়ে পড়েছিল, টিম সদস্যরা কাজে ঢিলা দিয়েছিল। নতুন ওপরতলার নেতৃত্ব এসে বলল, শুধু কঠোর জঙ্গিপনা আর আমলাতান্ত্রিক খবরদারিই নয়, পশ্চাদপদ গ্রামাঞ্চলের ওপর সমাজতান্ত্রিক ডোজটা বড্ড কড়া হয়ে গিয়েছিল। অতএব আড়াই দশকের গ্রামীণ সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে আসার পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হল।

১৯৭৯–তেই ওপরতলা থেকে নির্দেশ এল, দেশের সবচেয়ে দরিদ্র এবং দুর্বলভাবে সংগঠিত উৎপাদন টিমগুলোকে একটা 'নতুন কর্মসূচি' — পারিবারিক দায়িত্বের ব্যবস্থা — গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এই নির্দেশের আওতাধীন গ্রামে চাষি পরিবারগুলো আলাদাভাবে নিজের শস্যখেতে চাষ করতে পারবে এবং তা থেকে লাভ করতেও পারবে। এতে যে কোন টিমের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক। কিন্তু অতীতে পিকিং থেকে আসা যে কোন প্রচার–অভিযানে যেভাবে 'স্বেচ্ছামূলক' কর্মসূচি গৃহীত হত, এবারও সেরকমই হল। কিছু পার্টি আমলারা কাউন্টি বা নিচের স্তরে এই কর্মসূচি লাগু করতে গা না ঘামানোয় তাদের প্রকাশ্যে বামপন্থী চিন্তার জন্য সমালোচনা করা হল। ফলে চীন জুড়ে সমস্ত স্তরের ক্যাডাররা রাজনৈতিক হাওয়া বুঝে নিয়ে তড়িঘড়ি দেখাতে চাইল, বামপন্থী লেবেলটা তার জন্য নয়।

১৯৮০–তে কিংফা পার্টি সেক্রেটারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যৌথ মালিকানা থেকে প্রত্যাবর্তনের কাজে নেমে পড়তে হল। প্রত্যেক উৎপাদন টিম লটারি করে পরিবারগুলোকে চাষের জমি ভাগ করে দিল। এক–একটা পরিবার এক একরের এক–চতুর্থাংশ জমি পেল। প্রত্যেক টিমের রাষ্ট্রীয় শস্যের দেয় কোটা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারকে বাৎসরিক চাল বিক্রির দায় স্থির করে দেওয়া হল। এই রাষ্ট্রীয় দায় পূরণ করে সেই পরিবার নিজের ইচ্ছামতো সদ্য পাওয়া জমিতে চাষ করার স্বাধীনতা পেল। টিমের হাতে জমির মালিকানা থেকে গেল, চেন চাষিরা ফের খুদে চাষি হয়ে গেল। এরপর চাষের সরঞ্জামগুলোও টিম তার সদস্যদের মধ্যে বিক্রি করে দিল। হালের বলদগুলো নিয়ে সমস্যা হল। এক–একটার হাজার ইউয়ান দাম। সুতরাং সেগুলো টিমের হাতে রেখে কয়েকটা পরিবার মিলে এক–একটা বলদ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতি — থ্রেশার, ট্র্যাক্টর, গাড়ি — নিলামে সর্বোচ্চ দর দেওয়া ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হল। ব্রিগেডের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাক্টরটার জন্য ঋণ দেওয়া হল। নতুন মালিকেরা সেগুলো হাতে পেয়ে পড়শিদের কাছে সেগুলো ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা শুরু করল।

আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে টিম ও ব্রিগেড গ্রামের সমস্ত ফলের গাছ ও মাছের পুকুরের দায়িত্ব টেন্ডার ডেকে বিতরণ করে দিতে চাইল। যারা দায়িত্ব নিল, তারা প্রতিবছর নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার শর্তে গাছ ও পুকুরগুলোর সম্পূর্ণ অধিকার পেয়ে গেল। এইভাবে গ্রামের সম্পত্তি টুকরো টুকরো করে বিলিবন্টন হল। চেন গ্রাম এই নতুন প্রক্রিয়ায় গোড়ার দিকেই পা বাড়িয়েছিল। ১৯৮১ সালের শেষে চীনের এক–তৃতীয়াংশ উৎপাদন টিম মোটামুটি এই পদ্ধতিতেই গ্রামীণ পরিবারগুলোকে জমির ঠিকা দিয়ে দিল। যেসব গ্রাম থেকে আপত্তি এল, সত্তরের জঙ্গি জমানার মতোই স্থানীয় ইচ্ছাকে পাত্তা না দিয়ে চাষিদের এই পথে যেতে বাধ্য করা হল। গুয়াঙদঙ প্রদেশের সিনহুই কাউন্টির কিছু গ্রামে চাষিরা টিমের ডাকা লটারিতে যেতে চায়নি। তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতার ভয় হচ্ছিল। কেউ কেউ বলছিল, 'দেঙ শিয়াওপিঙ নিপাত যাক'। জিয়াঙসু প্রদেশের এক সমৃদ্ধ গ্রামে চাষিরা ভয় পাচ্ছিল, এই পথে গেলে নতুন মেকানাইজেশনের ফলে তাদের নিজেদের গড়ে তোলা যৌথ সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

চেন চাষিরা অবশ্য যৌথ চাষের জমি টুকরো করে ফেলতে আপত্তি করেনি। মধ্য ১৯৬০–এর মাও চিন্তাধারা পর্বের সহযোগিতা বোধ হারিয়ে গিয়েছিল। একলা চলতে চেন চাষিরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল না। তার একটা কারণ, বেশিরভাগ পরিবারের একটা ছেলে বা মেয়ে হঙকঙ থেকে টাকা পাঠাচ্ছিল। তাছাড়া, ১৯৮০–র বসন্তে কাউন্টি রাজধানীকে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' ঘোষণা করা হল, সেখানে জমির অভাবগ্রস্ত হঙকঙ শিল্পমালিকদের শিল্পের বিস্তার ঘটানোর অনুমতি দেওয়া হল। নাটকীয়ভাবে, এই কাউন্টির চাষিদের হঙকঙে সরাসরি খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করার ওপর থেকে চালু নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। এক পশ্চাদপদ বদ্ধ জলা — চেন গ্রাম — – এবার বিশ্ব মহানগরীর অর্থনৈতিক জগতে ঢুকে পড়ল।

যদিও কয়েকমাসের মধ্যেই কমিউনের বাজার–শহরে সরকারি কৃষি–উৎপন্ন সংগ্রহ দপ্তর বন্ধ করে দেওয়া হল। তার বদলে হঙকঙ থেকে পাইকারদের ক্রয়–কেন্দ্র খুলতে দেওয়া হল। রাষ্ট্রের কাছে যে দাম পাওয়া যেত, তার কয়েকগুণ দামে চেন চাষিরা সেখানে টাটকা উৎপন্নদ্রব্য বিক্রি করতে লাগল। হঙকঙে যাতে ঠিকমতো সরবরাহ করা যায়, সরকার চেন গ্রামের চালের কোটা ৪০ শতাংশ কমিয়ে দিল এবং চিনি ও চিনাবাদামের

কোটা তুলে নিল পুরোটাই। ফলে চেনরা তাদের জমিতে লাভজনক ফসল ফলানোর দিকে মনোযোগ দিল। কেউ কেউ নিচু ধানীজমিতে মাছ চাষ শুরু করল, যাতে হঙকঙে সেই টাটকা মাছ চড়া দরে বেচা যায়। নতুন চাষের ধরন আর ব্যবসার সুযোগ চেনদের আয় অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল, যা কোনকালে তারা পায়নি। কিন্তু গ্রামের সমর্থ পুরুষেরা অনেকেই হঙকঙে চলে যাওয়ায় গ্রামে কাজের লোকের দারুণ অভাব দেখা দিল এবং তাতে উৎপাদন ও লাভ দুই-ই মার খেতে বসল।

এবার পার্টি সমাজতন্ত্রের রাস্তা থেকে আরও সরে এসে চাষিদের মজুর ভাড়া করার অনুমতি দিল। সরকারিভাবে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল'-এর কাছাকাছি এলাকায় এই অনুমোদন হল। কিন্তু ১৯৮২-র গোড়ার দিকে গুয়াঙদঙের দূরবর্তী অঞ্চলেও তা চালু হয়ে গেল। আরও দরিদ্র প্রত্যন্ত কাউন্টি থেকে চাষের লোক আনতে লাগল চেনরা, বিশেষত ফসল কাটার সময়। এই ভাড়া করা মজুরদের থাকার জন্য হরিণদের আস্তানা গোলাবাড়িতে অস্থায়ী ডরমিটরি তৈরি করা হল। হরিণগুলো কিংফা ইতিমধ্যেই ব্রিগেডের ঋণ মেটাতে বিক্রি করে দিয়েছিল। এছাড়া এই মজুররা টিমের গুদামগুলোতে আশ্রয় নিল, কারণ চাষিরা এখন শস্য নিজের ঘরেই রাখত। 'সমাজতান্ত্রিক' শুয়োর প্রজননের যে সরকারি নির্দেশ সত্তরের দশকের গোড়ায় এসেছিল, তার জন্য উঁচু সিলিংওয়ালা ইটের খোপ বানানো হয়েছিল, নবাগত মজুরেরা সেখানে পর্যন্ত ভিড় করল।

এছাড়া, কাউন্টি রাজধানীর শিল্পায়নের ফলে সেখানে শহরের মজুরিতে চাষিদের নিয়োগ করা হচ্ছিল। সেখানকার নির্মাণ প্রকল্পে এবং চীনা সরকার ও হঙকঙের পুঁজিপতিদের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্লাস্টিক ফ্যাকট্রিগুলোতে ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় চেন যুবতীরা কাজ করতে গেল। মেয়েদের জায়গায় খেতের কাজে আরও বাইরের লোক লাগাল চেন পরিবারেরা। ১৯৮২ সালের মধ্যে গ্রামে নিয়মিত একশ বাইরের মজুর খাটত। তাদের কেউ কেউ পরিবার নিয়ে এসে থাকতে শুরু করল।

১৯৮০-তে কিংফা 'বিশেষ শিল্পোদ্যোগগুলো ঠিকা দেওয়া'র নতুন নীতি অনুযায়ী নিলাম ডেকে ব্রিগেডের ফ্যাকট্রিগুলো একবছরের কন্ট্রাক্টে দিয়ে দিল। চারটি চেন পরিবার একত্রে চিনিকলটা লিজ নিল এবং সেখানে মজুর নিয়োগ করল। শর্ত ছিল একটাই, একবছরের মেশিন পরিষ্কার ও সারানোর দায়িত্ব ঠিকাদারের। ইট কারখানাটা দেওয়া হল সম্পূর্ণ অজানা এক চীনা পুঁজিপতিকে। সে এক ডজন শ্রমিক সঙ্গে নিয়ে এল। যৌথ মালিকানা নাকচের এত বড়োসড়ো ঘটনাগুলো চেয়ারম্যান মাওয়ের মৃত্যুর মাত একবছরের মধ্যেই ঘটে যেতে থাকল। গ্রামের স্টোর চারটি পরিবারের এক কোঅপারেটিভের হাতে দেওয়া হল; স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি মাত্র পঞ্চাশ ইউয়ানের বিনিময়ে তুলে দেওয়া হল গ্রামের নগ্নপদ চিকিৎসকের হাতে। সেও ব্যবসার হাওয়ায় রোগীদের কাছ থেকে ইনজেকশনের ফি ১ ইউয়ানের ওপর বাড়িয়ে দিল। স্কুলটা সরকারি হেফাজতে থাকল বটে, কিন্তু শিক্ষকেরা ক্লাসে লজেন্স বিক্রি করে বাড়তি পয়সা কামানো শুরু করে দিল। অভিভাবকেরা রেগে গিয়ে তাদের নিরস্ত করল।

একজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তার কাকা নিজের ছেলেমেয়ের হঙকঙ থেকে পাঠানো অর্থে কয়েক হাজার ইউয়ান দামের একটা ছোটো ট্র্যাক্টর কিনে ফেলে। একটা লোককে কাজে লাগিয়ে সে ওই ট্র্যাক্টরটা নির্মাণসামগ্রী বওয়ার কাজে ভাড়া খাটাতে শুরু করে। তারপর সে একটা ছোটো দোকান খোলে। লোকে বলত, এসব করে ওই ব্যবসায়ী বছরে ৬০০০ ইউয়ান কামাত। অথচ সেই সময় চেন চাষিদের পূর্ণসময় চাষে গড় আয় হত ২০০০ ইউয়ান। এই চেন ব্যবসায়ী ব্যবসার কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, ১৯৮২-র গোড়ায় দ্বিতীয়বার জমি বিলির সময় সে জমি নিল না, চাষ থেকে পুরোপুরি সরে গেল। এইসময় টের পাওয়া গেল, জমি আধা-স্থায়ীভাবে চাষিদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা জমির উন্নতি ঘটায়। ফলে ১৯৮২-র মধ্যে জমি ব্যক্তিগত মালিকানার সমতুল্য হয়ে গেল। টিমের ক্যাডারদের কোটার চাল সংগ্রহ এবং চাষের সরঞ্জাম বিতরণ ছাড়া তেমন কোন কাজ ছিল না। কেউই টিম-প্রধানের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাইছিল না, কারণ সাধারণ চাষির মন ছিল টাকা কামানোর দিকে।

পার্টির কাউন্টি নেতৃত্ব থেকে কিংফা, পার্টি শাখার বাকি সদস্য এবং সমস্ত স্তরের ক্যাডাররা নিজের নিজের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে অবস্থাপন্ন হওয়ার দৌড়ে খোলাখুলি নেমে গিয়েছিল। সাধারণ চাষিরাও থেমে থাকেনি। ১৯৭৯-তে যারা হঙকঙে গিয়েছিল, তারা অনেকেই নির্মাণশিল্পে কাজ পেয়েছিল। তারা পরিবারের জন্য টাকা জমাত এবং নববর্ষের সময় বাড়ি ফিরত বিদেশি জিনিসপত্র নিয়ে। বেশিরভাগ পরিবারের ইলেকট্রিক ফ্যান ছিল, অনেকে ইলেকট্রিক রাইস কুকার ব্যবহার করত আর হঙকঙের ফ্যাশনদার জামাকাপড় পড়ত প্রায় সকলেই। আগে ঘরেই জামাকাপড় সেলাই করে নেওয়া হত। সেলাইকলে এবার মরচে ধরে গেল। ১৯৮২ সালের মধ্যে চেন গ্রামের প্রায় অর্ধেক বাড়িতে হিটাচি কোম্পানির রঙিন টিভি এসে গিয়েছিল। সেই টিভি খুললেই চীনা ও হঙকঙের প্রোগ্রামগুলো দেখা যেত। সন্ধ্যাবেলায় চেনরা হঙকঙের সোপ অপেরা, কুঙফু-র ছবি আর রকমারি প্রোগ্রামে সেঁটে যেত। এক অভিবাসী শ্রমিক এক সপ্তাহের জন্য বাড়িতে এসেছিল। সে বলেছিল : "১৯৮০ থেকে চাষিরা আর রাজনৈতিক সভায় যেত না। যখন গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন বিষয় আসত, কিংফা রেডিও মারফত তা ঘোষণা করে দিত। নাহলে রেডিও বন্ধই পড়ে থাকত। রাজনৈতিক সভায় না যাওয়ার ফলে চাষিরা আর সরকারি নীতিগুলো জানতে পারত না। কী ঘটছে, তা জানত কেবল ক্যাডাররা।"

চার সংশোধন বাতিল, গ্রামীণ নৈতিকতা উধাও

১৯৭৭ সাল থেকে আর কোন প্রচার-অভিযান বা গ্রামে ওয়ার্কটিম পাঠানোর চিহ্ন দেখা যায়নি। সরকারি চীনা গল্পের সেই ন্যায়পরায়ন, সংযমী, আত্মত্যাগী পার্টি ক্যাডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বাসনা পার্টি সেক্রেটারি হিসেবে কিংফার এতটুকুও ছিল না। লঙইয়ঙ তার দোষত্রুটি নিয়েই সেই মডেলটাকে পুঁজি করতে চেয়েছিল বটে। কিন্তু সেই সময়টা চেনরা পার হয়ে এসেছিল। চার সংশোধনের প্রচার-অভিযান কিংফা এবং তার মতো অনেক চীনা ক্যাডারকেই 'শুদ্ধ' করে তুলতে পারেনি।

নদীর কাছে একটা বিশাল বাঁশঝাড় ছিল। সেটা নিলামে না তুলে কিংফা কমিটির সায় নিয়ে মাত্র ১০ ইউয়ানে কিনে ফেলল। অথচ সেটার দাম ছিল তার একশ গুণেরও বেশি। কয়েক বছর আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য লাগানো পাহাড়ি এক লতার বাগান — যেটা ওষুধ তৈরিতে লাগত — সে হস্তগত করল। ব্রিগেডের ভাড়া করা বুলডোজার দিয়ে সে জায়গাটা সমান করে নিল। তারপর সেই জমির বেশিরভাগ নিয়ে সেখানে দুজন মজুর লাগিয়ে দিল। এইভাবে ব্রিগেডের সম্পত্তি যোগসাজশ করে হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা বহু গ্রামেই ঘটছিল (সাদার্ন ডেলি, ৩০ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ. ২)। এর ওপর চেন গ্রামের স্বার্থরক্ষার নামে নিজের কাছের লোককে পাইয়ে দেওয়ার কাজগুলোও কিংফা চালিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৮১-তে হঙকঙে দুই অভিবাসী চেন-যুবকের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে কিংফা বলল, "আমাদের আশপাশের অন্য সব গ্রামের ট্রাক আর নৌকা আছে, আমাদেরই কেবল নেই"। একথা শুনে অভিবাসী চেনরা দ্রুত ষাট হাজার হঙকঙ ডলার (দশ হাজার মার্কিন ডলারের সমান) চাঁদা তুলে ফেলল; সেই টাকায় জলপথে হঙকঙের সঙ্গে ব্যবসা

চালানোর জন্য একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড আড়াই টনের ট্রাক আর একটা পঞ্চাশ ফুটের নৌকা কেনা হল। পূর্বতন পার্টি সেক্রেটারি জিনঈ এখন ডেপুটি সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছিল, ট্রাকটা প্রায় একটা বেসরকারি ব্যবসার মতো তার ছেলেকে চালাতে দেওয়া হল। গ্রামীণ উদ্যোগের ক্ষেত্রে পরিবহণ ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। যে সাতজনকে নৌকাটা চালানোর জন্য নিযুক্ত করা হল, তারাও ছিল কিংফার আত্মীয় কিংবা ঘনিষ্ঠ।

পার্টি সেক্রেটারি হিসেবে কাজের দায়িত্ব কমে গেলেও চাষিদের ওপর কিছুটা ক্ষমতা কিংফার তখনও ছিল। গ্রামে কোন কিছুর অনুমোদন পেতে গেলে তার সম্মতি লাগত। বাইরে থেকে যুবকেরা যখন গ্রামে ফিরত, তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করত কিংবা প্যাকেট কয়েক বিদেশি সিগারেট উপহার দিত। অন্য গ্রামের একজন বলেছিল : "আজকাল ক্যাডাররা আপনাআপনিই গ্রামের তাজা মাছ জাতীয় জিনিসপত্র পেয়ে থাকে। চাষিরা এগুলো দেয় এবং বিনিময়ে কিছু সুযোগসুবিধা আশা করে। আমার কাকা একজন ক্যাডার। সে একটু মুখ খুললেই গ্রামের লোক এসে তার জমিতে বেগার খেটে দিত ... কখনও কখনও চাষিরা পিছনে ক্যাডারদের 'বস' বলে সম্বোধন করত।"

গ্রামে প্রথম রেফ্রিজারেটর কিনেছিল কিংফা। তার আর পুরনো বাড়িতে মন ভরছিল না। হাতে অনেক টাকা আসছিল, সে গ্রামের কমিউনিটি হলের পাশে সবচেয়ে মূল্যবান জায়গাটা নতুন বাড়ি করার জন্য বেছে নিল। সেখানে সাদা আর সোনালি টাইল্‌স বসানো তিনতলা বাড়ি তৈরি করল। নির্মাণ শ্রমিকদের চালু রেট ছিল দৈনিক ৫ ইউয়ান; কিন্তু সে মাত্র ৩ ইউয়ান দিয়েই কাজ সারল। যেহেতু চেন চাষিরা আর্থিকভাবে উন্নতি করছিল, ফলে এসব নিয়ে তারা মুখ খুলত না। তারা মনে করত, "কমিউন স্তর যদি মাথা না ঘামায়, তাহলে এটা ব্রিগেডের নিজেদের ব্যাপার"।

লঙইয়ঙও হাওয়া বুঝে বড়োলোক হওয়ার দিকে মনোযোগ দিল। সে গ্রামের শস্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট লিজ নিয়েছিল। সেখানে দুজন মজুর লাগিয়ে নিজে গ্রামের বাইরে ঘুরে ঘুরে দরিদ্রতর জেলাগুলো থেকে গরুছাগল কিনে সমৃদ্ধতর জেলায় বিক্রি করত। এটা ছিল সম্পূর্ণ বেআইনি। কিন্তু সেটা সামলানোর মতো সরকারি যোগাযোগ ক্যাডার হিসেবে তার ছিল। জিনঈও আর আগের মতো সৎ ছিল না। সেও লঙইয়ঙের মতো এই বেআইনি কাজে বাড়তি টাকা কামাতে বেরিয়ে পড়ত।

১৯৮০-র দশকের গোড়ায় 'জুয়া আর চুরির হাওয়া জোর বইছিল'। সংগঠিত জুয়া বন্ধ করতে কাউন্টি থেকে যখন অভিযান চালানো হল, চেন গ্রামে রাতের জুয়ার ঠেক বাসিন্দাদের ঘর থেকে সরকারি এক বাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে কোন পরিবার অসুবিধায় না পড়ে। এই রাতের ঠেকে আশপাশের জেলা থেকেও লোকে খেলতে আসত। চুরিডাকাতি এত বেড়ে গেল, চোরেরা গরুর গাড়ি নিয়ে চুরি করতে আসত। পুলিশও এতে কর্ণপাত করত না। একজন বলেছিল : "ওরা চোরের চেয়ে জুয়াড়ি ধরতে পছন্দ করত, কারণ প্রত্যেক জুয়ার ঠেকের জন্য কাউন্টি থেকে পুলিশকে একটা বোনাস দেওয়া হত।"

আরও প্রত্যন্ত এক গ্রামের এক বাসিন্দা বলেছিল : "চাষিদের বড়ো ক্ষোভ হল সামাজিক শৃঙ্খলার অবনতি। আজকাল ব্রিগেডের সামরিক বাহিনী অন্য গ্রামে গিয়ে চুরি করছে বলে শোনা যাচ্ছে। কর্তারা কেউই এ নিয়ে আমল দিচ্ছে না। কারণ এখন আর কোন প্রচার-অভিযান নেই। ক্যাডাররা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত। কেউই অবস্থাটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।"

সত্তরের শেষদিকে চার সংশোধন কর্মসূচির সময় গ্রামের পাড়াগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা হত।এখন সেগুলো জঞ্জালে ভরে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে। সর্বসাধারণের নৈতিকতার দ্রুত অবক্ষয়ে গ্রামবাসীরা বিব্রত, কিন্তু মাও জমানার ন্যায়পরায়ণতা আর আঁটসাঁট নৈতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে তারা হাঁফ ছেড়েছে। চার খারাপ শ্রেণীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় তাদের প্রতি আলাদা ব্যবহার ঘুচে গেল রাতারাতি। এখন যে কোন পরিবারের কাছে বড়ো কথা হল অর্থ আর উপার্জন। পঞ্চাশের দশকের ভূমি সংস্কারের পর এই প্রথম গ্রামের পুরনো প্রবীণ জমিদাররা পর্যন্ত অন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা শুরু করল।

পরিবর্তিত অবস্থার সুযোগে কিংফার একসময়ের দোস্ত পুরনো গেরিলা এবং পরে খারাপ শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিটিও কাস্টম্‌স অফিসের কাজে ফিরে এল। তার ছেলেকে উৎপাদন টিমের প্রধান পদ দেওয়া হল। কিন্তু একবছরের মধ্যে কাস্টম্‌সে মাল চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ল। পুরনো গেরিলাটি নতুন আলগা সময়ের বড্ডো বেশি সুযোগ নিতে গিয়েছিল। তার বন্ধু কিংফাও অবশ্য বড্ডো বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৩-তে পিকিং বিষাক্ত পশ্চিমি 'বুর্জোয়া উদার' ভাবনাচিন্তার আগাছা উৎপাটিত করতে 'আত্মিক দূষণ বিরোধী প্রচার-অভিযান' ঘোষণা করল। সেই কর্মসূচিকে জনপ্রিয় আবরণ দেওয়ার জন্য দুর্নীতি-বিরোধী অভিযানকে সঙ্গে জুড়ে দিল। লঙইয়ঙ এই সুযোগ পেয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের খুদে-গোষ্ঠীর প্রাক্তন প্রধান সানওয়াঙকে জুটি করে কিংফার নামে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ দায়ের করল কমিউনে। কমিউন পার্টি সেক্রেটারি নিজে চেন গ্রামে এলেন তদন্ত করতে। সেখানে সাধারণ সভায় বেশ কিছু গ্রামবাসী এসে জানাল, কিংফা বিশেষ বিশেষ ঘটনায় তাদের ঘুষ দিতে বাধ্য করেছে। কমিউনের কর্মচারী হিসেবে বোকা অভিযোগগুলো লিখে নিয়ে একটা আইনি রিপোর্ট বানিয়ে ফেলল। কিংফাকে চার থেকে পাঁচ হাজার ইউয়ান ফাইন করা হল এবং বাঁশঝাড় ও তার হস্তগত করা কিছু ব্রিগেডের সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিতে বলা হল। পার্টি সেক্রেটারির পদ থেকে সে তখনই বরখাস্ত হল এবং পরে তার পার্টির সদস্যপদও গেল।

এত বড়ো ধাক্কা খেয়েও কিংফা ভেঙে পড়ল না। সে পুরোপুরি পয়সা রোজগারের ধান্দায় মনোনিবেশ করল। পাহাড়ের কোলে বড়ো জমি কন্ট্রাক্ট নিয়ে দরিদ্রতর জেলা থেকে মজুর আনিয়ে সে আনারস ও মিষ্টি আলুর চাষ করল এবং একটা বাগান তৈরি করল। কয়েক বছরের মধ্যেই সে সরকারি ক্ষমতার বদলে একটা ছোটোখাটো ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি গড়ে নিল। কিন্তু ১৯৮৬ সালে তার এক মজুরের বিয়েতে কাউন্টি থেকে কয়েক ঘন্টার দূরত্বে ভোজ খেয়ে ফেরার সময় পথ-দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হল। গ্রামের লোক তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনে করল, এটা ভগবানের মার, এমনটাই হওয়ার ছিল। কিন্তু যে বিনি পয়সার ভোজ খাওয়ার লোভ এবং পেটুকপনা কিংফার মৃত্যু ডেকে এনেছিল, আগামী বছরগুলোতে সেটাই সাধারণ চেনদের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল।

কিংফার পর পার্টি সেক্রেটারি করা হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের খুদে-গোষ্ঠীর প্রাক্তন প্রধান এবং কিছুটা সৎ পঞ্চাশোর্ধ সানওয়াঙকে। কিন্তু পার্টি চাইছিল গ্রামে বয়সে নবীন এবং কিছুটা শিক্ষিত নেতা। ১৯৮৫-তে কমিউন পার্টি তাকে সরিয়ে আনল ৩৫ বছর বয়স্ক দু-এক বছর জুনিয়র হাইস্কুলে পড়া বাওদাই-কে। কৈশোর থেকেই সে ভালো বক্তা ছিল। চার সংশোধন প্রচার-অভিযানে ওয়ার্কটিম তাকে মাও চিন্তাধারা প্রচারক মনোনীত করেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সে প্রেরিত যুবকদের পাল্লায় পড়ে আরও চার ভালো শ্রেণীর যুবকের সঙ্গে বিদ্রোহী রেডগার্ড গ্রুপে ভিড়েছিল। কিন্তু দ্রুত ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এসেছিল এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের খুদে গোষ্ঠীতে তাকে 'যুব' প্রতিনিধি হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছিল। শ্রেণীর সাধারণ অংশকে শোধন করার অভিযানে বাওদাই আওয়ের তদন্তকারী দলে প্রতিবিপ্লবীদের জবানবন্দী নেওয়ার কাজে সক্রিয়

ভূমিকা নিয়েছিল। সে প্রত্যাশিতভাবেই কমিউনিস্ট ইউথ লিগের সেক্রেটারি হিসেবে ব্রিগেডের আসন পেয়েছিল। কয়েক বছর পরে তাকে গ্রামের সামরিক বাহিনীর প্রধানের পদ এবং তারপর জন-নিরাপত্তা প্রধানের পদ দেওয়া হল। এরপর তার নেতা হওয়ার যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে একটা উৎপাদন টিমের প্রধান করা হয়।

চেনরা মনে করত, কিংফার প্রচুর জ্ঞাতি-গুষ্টি থাকাতে সে অন্যায়ভাবে তাদের সুবিধা দিতে কিছুটা বাধ্য হত। বাওদাইয়ের বাবা এক উদ্বাস্তু শিশু হিসেবে গ্রামে এসেছিল। তাকে আশ্রয় দিয়েছিল সন্তানহীন একটি পরিবার। বাওদাইয়ের মতো ১৯৫০-এর দশকে প্রথম পার্টি সেক্রেটারি চেন সুমেই এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের খুদে গোষ্ঠীর প্রধান চেন সানওয়াঙের রক্ত-সম্পর্কে কেউ ছিল না। একসময় বংশগত গ্রাম চেনে সেই অবস্থাটা দারুণ অসুবিধাজনক মনে করা হত। কিন্তু এখন গ্রামের লোকে মনে করল, এরকম নেতা অন্তত আত্মীয়তার বিচারে পক্ষপাতিত্ব করবে না। বাওদাই এসেছিল ৪ নং টিম থেকে, যে টিমে লঙইয়ঙ ছিল এবং যে টিমকে জমি অনুমোদনের ক্ষেত্রে ১৯৬১-৬২ সালে কিংফা বঞ্চিত করেছিল।

বাওদাই পরবর্তী বছরগুলোতে গ্রামবাসীর আশা পূরণ করেছিল। সে পার্টি সেক্রেটারি হিসেবে বছরে ১৫০০ ইউয়ান পেত, যা গড় পরিবারের আয়ের থেকে কম। অতএব তার কাজের এলাকা থেকে ব্যক্তিগত উপহার এবং অর্থ নেওয়াকে চেনরা দুর্নীতি মনে করত না। কারণ তারা জানত, গ্রামের সবচেয়ে সফল উদ্যোগপতির জীবনযাত্রা তার পাওয়া উচিত। বহু গ্রামে কিংফার মতো অতিলোভী ক্যাডাররা এই আয়ের সীমা ছাড়িয়ে ঘুষ ও পাওনা দাবি করত। বাওদাইয়ের 'নেওয়া'টা ছিল সম্রাটদের যুগে চীনা প্রশাসনের কর্তাদের নিয়মিত অভ্যাসের মতোই। কাউন্টির পুলিশেরাও এই অভ্যাস চালাত। এক চেন পরিবার একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড মিনিবাস কিনে কাউন্টির প্রধান সড়কে চালাতে শুরু করেছিল। ওই রাস্তার ওপর প্রতিটি কমিউন শহরে পুলিশ এইরকম বাস-সার্ভিস থেকে ফাইন ও ঘুষ আদায় করত। এই ব্যাপক এবং আলাদা আলাদা তোলা আদায় এমন জায়গায় পৌঁছাল যে সেই পরিবার ব্যবসাটা বন্ধ করে দিল। ভিন্ন ভিন্ন পুলিশের ইউনিটগুলোর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা আদায়কে একটা সীমার মধ্যে রাখতে আরও বেশ কয়েক বছর লেগে গেল।

বিশ্বায়িত চীনে রাষ্ট্রের ভূমিকা, শ্রম-নীতি এবং গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের সংগ্রাম

তমাল ভৌমিক

হঙকঙ-এর সিটি ইউনিভার্সিটির ক্রিস কিং-চি চ্যান, হঙকঙ পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির পুন গাই এবং ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের জেনি চ্যান-এর এক যৌথ রচনা এবং শেষোক্ত দুজনের আরও একটি রচনার ভিত্তিতে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। এই প্রবন্ধে আলোচিত 'চাষি-শ্রমিক' সত্তা — যে সত্তায় শ্রমিকের গ্রামসমাজের বন্ধন ছিন্ন হয়নি — চীনের এক বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত রচনা দুটি থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের আগেও চীনে এই বৈশিষ্ট্যের রকমফের দেখা যেত। ভারতবর্ষে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে আমরা বরাবরই এই 'চাষি-শ্রমিক' সত্তার সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত। অথচ আমাদের প্রচলিত অর্থনীতি-শাস্ত্রে এই বর্গের আলোচনা তেমন গুরুত্ব সহকারে পাওয়া যায় না। চীনের শেনঝেন শিল্পাঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের ফলতা শিল্পাঞ্চলের স্পেশাল ইকনমিক জোন বা SEZ-এ এই চাষি-শ্রমিকদের ব্যাপক আকারে ব্যবহার করা হয়েছে।

২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটে পশ্চিমি পুঁজিবাদী দেশগুলো বড়ো ধরনের ধাক্কা খেয়েছিল। এরকম একটা ধারণা চালু আছে যে, ওই অর্থনৈতিক দুর্যোগকে যেসব দেশ সামাল দিতে পেরেছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল চীন। সাধারণের বিশ্বাস — চীনের শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যা কিনা নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনের সাথে মানানসই ভাবে চীনের ভূমিকাকে বদলে নিতে পেরেছিল এবং দেশের ভিতর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল, তার জন্যই ওই সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু চীনের শ্রমনীতি ও সেখানকার শ্রমিকদের লড়াইয়ের ঘটনাগুলোর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, এই বিশ্বাস ধোপে টেকে না।

চীন এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে 'দুনিয়ার কারখানা'য় পরিণত করেছে। আমরা বলতে চাই, এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র তা ঘটিয়েছে সেইসব আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে আঁতাত করে, যারা নিজেদের মুলুকের বাইরে গিয়ে উৎপাদন করানোর জন্য জায়গা খুঁজছিল। ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে পরিকল্পনা ও বাজারের দ্বৈত-পথের নীতি পিছনে চলে গিয়ে নতুন অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি এল। ১৯৯২ সালে শেনঝেন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (স্পেশাল ইকনমিক জোন বা সংক্ষেপে এসইজেড) ও গুয়াঙদঙ প্রদেশে দেঙ শিয়াওপিঙ-এর 'দক্ষিণে ভ্রমণ'-এর পথ ধরে বিদেশি বিনিয়োগের নতুন ঢেউ উঠল। চীনা রাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্যিক সংস্থা (ডব্লুটিও)-র সদস্য হওয়ার জন্য ২০০১-এর নভেম্বরে প্রবল প্রচেষ্টা চালাল — যাতে একুশ শতকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন আরও এগিয়ে যেতে পারে। ২০০২ সালে, বিদেশি বিনিয়োগের সরাসরি ক্ষেত্র হিসেবে (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা এফডিআই) চীন সকলের সামনের সারিতে চলে এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টপকিয়ে। ২০০৫ সালে চীনের মোট রপ্তানি দ্রব্যের ৫৭.৩ শতাংশ ছিল বিদেশি বিনিয়োগ সংস্থার আর এদের মাধ্যমে বিশ্বের উচ্চ-কারিগরি রপ্তানির ৮৭.৯% চীন থেকে রপ্তানি হল। ২০০৮ সালে চীনে এফডিআই ২০০৭-এর চেয়ে ২৬.২% কমে গেলেও ওই বছরই অক্টোবরের মধ্যে আরও ২২,৭৩৬টি বিদেশি কোম্পানি চীনে ব্যবসা করার অনুমতি পেল (সূত্র : চীনা বাণিজ্য মন্ত্রক, ১৬ জানুয়ারি ২০০৩, ১২ জুন ২০০৬ ও ১৭ নভেম্বর ২০০৮)।

পারিবারিক শ্রমক্ষেত্রে পুঁজির হস্তক্ষেপ এবং ছোটো শিল্পসংস্থাকে অনিবার গ্রাস করে ফেলা — এসবই বাজার-চালিত, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতির অভিমুখও সেইদিকে। চীনের রাজনৈতিক নেতারা ছোটোখাটো পণ্যের পিছিয়ে পড়া বাজার-হাট চায় না, তারা চায় আধুনিক সুপার মার্কেট, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় যারা 'বিজয়ী', তাদেরই সুনাম করে তাদেরই সমর্থন করে এই রাষ্ট্রের হর্তাকর্তারা।

পশ্চিমি ভাষ্যকারেরা — রাজনৈতিকভাবে তারা বাম বা দক্ষিণ যে পন্থীই হোক না কেন — শুধু চীনের অর্থনৈতিক উন্নতিকে বাহবা জানিয়ে যায়। সে উন্নতির দৈব বিভা ছড়িয়ে থাকে বেজিং আর সাংহাইয়ের নাগরিক আকাশরেখায় আর থাকে সংবাদমাধ্যমের চমকে দেওয়া সব অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে। যেমন, ২০০২ সালে পোশাক শিল্প, রঙিন টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, ক্যামেরা, রেফ্রিজারেটর, এয়ার

কন্ডিশনার, মোটর সাইকেল, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, পিসি মনিটর, ট্র্যাক্টর ও সাইকেল সহ ৮০টি দ্রব্যের উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে প্রথম; ২০০৫ সালে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যকারী দেশ হিসেবে চীনের অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানীর পরেই তৃতীয় স্থানে; ২০০৭ সালে উন্নত কারিগরি রপ্তানি দ্রব্যের হিসেবে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্টের পরেই দ্বিতীয় স্থানে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও চীন জাপানকে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে।

বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীনের এই উত্থান — নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন — বিশ্বায়নের যুগে মুক্ত বাজারের সাধারণ ফলাফল হিসেবে হয়নি, সংস্কার ও খোলা অর্থনীতির এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে ত্রিশ বছরের সমাজতন্ত্র এক প্রবল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে।

২০০১–এর ১১ ডিসেম্বর ডব্লুটিও–র সদস্যপদ পাওয়ার পর চীন রপ্তানি ও বিনিয়োগ আরও দ্রুত বাড়িয়েছে। ২০০৪–এ পোশাক শিল্পে মোট বিশ্ব–বাণিজ্যের ২৬.৬% রপ্তানি করে চীন দুনিয়ার এক নম্বর রপ্তানিকারী দেশ। ওইবছর চীনে পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ, পৃথিবীর ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মোট নিয়োজিত শ্রমিকের ১৮.৯%। এখন চীন ইলেকট্রনিক দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে এক নম্বর। এর মধ্যে প্রধান হল কম্পিউটার, সেলফোন, এমপিথ্রি ও খেলার সরঞ্জাম।

কিন্তু চীনের এইসব বিশ্বায়িত কারখানার দিকে নজর ফেরালে দেখা যাবে, সেখানে মেহনত এত সস্তা যে তা মেক্সিকোর মজুরির ছয় ভাগের এক ভাগ। ১৯৯০–এর দশক থেকে পরবর্তী ১২ বছরের মধ্যে দক্ষিণ চীনের পার্ল নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে চীনের পৌর প্রশাসন শ্রমিকদের মাইনে বাড়িয়েছে মাত্র ৬৮ ইউয়ান (১০ মার্কিন ডলারের সমান)। রাষ্ট্র এমন এক নীতি নিয়ে চলছে, যার ফলে গ্রামাঞ্চলের শ্রমশক্তিকে তুলে এনে সস্তায় শোষণ করা যাচ্ছে। আবার রাষ্ট্রই এই নতুন শ্রমিকদের সামান্যতম সুবিধা ও অধিকার দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব হাত–পা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে যেমনভাবে 'এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ও টেকনলজি এক্সপেরিমেন্টাল জোন' গড়ে উঠছে, চীনেও এই ধরনের পণ্য রপ্তানি ও কারিগরি–পরীক্ষামূলক অঞ্চল বা 'জোন' দ্রুত গড়ে উঠেছে। সেখানে তরুণ চাষি-শ্রমিকদের, বিশেষত মহিলাদের কাজে লাগানো হয়েছে। কারণ এরাই সবচেয়ে সস্তার এবং সবচেয়ে বাধ্য শ্রমিক। সরকারি কর্তারা চালু 'হুকোউ' — হাউসহোল্ড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম — বা পরিবারভিত্তিক তালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থার বাঁধনে খানিক ঢিল দিয়েছে। গ্রামীণ 'উদ্বৃত্ত শ্রম'-কে যাতে সমৃদ্ধিতে ফুলে ফেঁপে ওঠা শহরগুলোতে চালান করা যায়, সে ব্যাপারে সক্রিয় যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। ১৯৯০–এর দশকের মাঝামাঝি এক গ্রামীণ সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রাম থেকে শহরে আসা শ্রমিকের সংখ্যা সারা দেশে তখন পাঁচ থেকে সাত কোটি। ২০০৬ সালের 'স্টেট কাউন্সিল'–এর হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা ছিল ১৩ কোটিরও বেশি। আজ আরও বেড়েছে।

গ্রাম থেকে শহরে আসা এই শ্রমিকদের ওদেশে বলা হয় 'ড্যাগং', এক নতুন শ্রমিকশ্রেণী। চাষিঘর থেকে আসা এই তরুণ–তরুণীর আত্মপরিচয় হল ড্যাগং, মানে 'বসের চাকর', যে মজুরির বদলে খেটে দেয়। পুঁজিপতির কাছে এই শ্রম–বিক্রি হচ্ছে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে। 'গংগ্রেন' মানে শহুরে শ্রমিক, যার অর্থ — মাও জমানার সমাজতান্ত্রিক পরিভাষায় — সর্বোচ্চ সম্মানিত শ্রেণী। তার প্রতিতুলনায় এই নতুন শব্দ 'ড্যাগং' হল হীন পরিচয়সূচক, যার মানে বাজারের এক ভাড়াখাটা হাত ছাড়া আর কিছু নয়।

চীনে চাষি-শ্রমিক অবশ্য নতুন নয়। ১৯৪৯ সালের আগেও চীনের তিয়ানজিন ও সাংহাইয়ের মতো বড়ো শহরগুলোতে এরকম গ্রাম থেকে আসা মজুরদের দেখা যেত। সমাজতান্ত্রিক জমানাতেও এদের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্রে এবং সমবায় সংস্থাগুলোতে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানো হত। যাই হোক, নতুন প্রজন্মের চাষি-শ্রমিকেরা কিন্তু পুরনোদের তুলনায় মৌলিকভাবেই আলাদা। ১৯৯০–এর দশকের শেষ থেকে ২০০০–এর প্রথম দশকে যারা বড়ো হয়েছে এবং কারখানায় খাটতে এসেছে, তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নতুন জীবনের প্রত্যাশা, নতুন মেজাজ আর আরও জোটবদ্ধ কর্মকাণ্ড। এদের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে অনেক বেশি ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্য, শহুরে ভোগ–বিলাসের সংস্কৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ, নিজস্ব উন্নতির তাড়না, স্বাধীনতার তাগিদ, বেশি পরিমাণ কাজ করা এবং কাজের প্রতি কম আনুগত্য। কিন্তু একইসঙ্গে নিজেদের কর্মস্থলে স্বতঃস্ফূর্ত দলবদ্ধ কর্মকাণ্ডে বেশি বেশি জড়িয়ে পড়া।

মাও–পরবর্তী চীনে এই নতুন সর্বহারাকরণ হয়েছে বিশেষভাবে রাষ্ট্রের আয়োজনে, গ্রাম থেকে বিপুল সংখ্যক খাটতে চাওয়া মানুষকে শহরে ঠেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। যেসব জায়গায় নতুন কারখানা–শিল্প গড়ে উঠছে — যেমন, উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে — সেখানে যাতে শ্রমের যোগানে টান না পড়ে, তার জন্য রাষ্ট্র প্রচুর ব্যবস্থা নিয়েছে। যেসব সরকারি দপ্তর শ্রম–ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আছে, তারা শহরের শ্রমের বাজারের দালালের ভূমিকা নিয়েছে। প্রথমে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে কম বয়সী মেয়েদের বেছে নিয়ে নিয়োগ–তালিকা তৈরি করেছে; তারপর তাদের গজিয়ে ওঠা কারখানা–এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এমনকী ওইসব সরকারি দপ্তরের শ্রম–অফিসারেরা কোন ট্রেনে কোন কামরায় কীভাবে গ্রামের মেয়েরা আসবে, তার খুঁটিনাটিরও ব্যবস্থা করে। তার বিনিময়ে তারা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাছ থেকে এই ব্যবস্থাপনার জন্য টাকা নেয়।

২০০০ পরবর্তী সময়ে গ্রামের কম বয়সী ছেলেমেয়েরা কৃষি–পণ্যের কম দাম, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও চাকরির সুযোগের স্বল্পতা নিয়ে ক্ষুব্ধ। বিশেষত সংস্কারের যুগে বেড়ে ওঠা তরুণ–তরুণীর কাছে গ্রামের এই অবস্থাটা অসহনীয়। ষোল–সতেরো বছর বয়স থেকে কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় তাদের থাকে না। মেয়েরা কেউ কেউ অবশ্য নিজের পছন্দমতো বিয়ে করা আর পারিবারিক কলহ ও পিতৃতান্ত্রিক খবরদারি এড়ানোর জন্যও গ্রাম ছাড়তে চায়। কিন্তু অধিকাংশই চায় ছোটো গণ্ডি ভেঙে বড়ো জায়গায় আসতে, চায় আধুনিক জীবনের স্বাদ নিতে আর শহরের রঙ–ঢঙ ভোগ করতে। রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নের নীতি এইভাবে ব্যক্তি–মানুষের আপন গণ্ডি ভেঙে বেরোনোর সিদ্ধান্তকে এমন এক আকার দিল, যা গ্রাম থেকে উপকূলবর্তী শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সরবরাহের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যকেই পূরণ করল।

গ্রামীণ পরিবারের তালিকাভুক্ত (ওয়েজ লেবারার্স অফ রুরাল হাউসহোল্ড রেজিস্ট্রেশন) চাষি-শ্রমিকদের সরকারি একটা বর্গে ফেলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণী পরিচয় দুটোই ঘোলাটে করে দেওয়া হল। সমাজতন্ত্র পরবর্তী চীন তাদের গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু শহরে স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার দেয়নি। পরিবারভিত্তিক তালিকাভুক্তি (হুকৌ) ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরের সর্বস্তরে স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে এমন এক পার্থক্যরেখা রাষ্ট্র স্থায়ীভাবে টেনে রেখে দিয়েছে, তার জোরে গ্রাম থেকে আসা চাষি–শ্রমিকদের থাকার জায়গা দেওয়া, চাকরির নিরাপত্তা এবং রেশন ইত্যাদি অন্যান্য পরিষেবা দেওয়ার দায় এড়িয়ে চলেছে রাষ্ট্র। এর ফলে এই অভিবাসী শ্রমিকেরা অনেকেই যে কারখানায় কাজ করে সেই কারখানা–মালিকের ডরমিটরিতে বা আবাসনে মাথা গুঁজছে অথবা শহরের কাছাকাছি গ্রামাঞ্চল থেকে আসা শ্রমিকদের নিম্নমানের বাসায় থাকছে।

এই হল সামাজিক বিশ্বায়নের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি : চীনা রাষ্ট্রের কাছে গ্রামের লোকের গতরটা প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই গতর বেচতে একবার গ্রাম থেকে শিল্পশহরে আসার পর তাদের আর শহরে জীবনযাপন করতে দেওয়ার দরকার নেই। এই নতুন শ্রমিকশ্রেণীর শহরে শিকড় গাড়ার বা শহরের বাসিন্দা হিসেবে আত্মপরিচয়ের কোন অধিকার নেই।

শহরের মধ্যে এক অস্বাভাবিক উদ্বাস্তু অবস্থান গ্রাম থেকে আসা শ্রমিকদের এক ক্ষণস্থায়ী চরিত্র গড়ে তোলে। বিশেষত একজন মহিলা শ্রমিককে দেখা যায়, বিয়ের আগে কয়েক বছর সে শিল্পশহরে মজুরি–শ্রমিকের কাজ করছে। তারপর বিয়ের বয়স হলে বেশিরভাগ মহিলা শ্রমিক গ্রামে ফিরে যায়। কারণ শহরে তাদের বিয়ে করার মতো ছেলে পাওয়া যায় না। গ্রামের দিকে বিয়ে, বাচ্চা হওয়া ও সংসার করার একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা পরিবার–জীবনে আছে এবং এখনও বেশ কিছুদিন থাকবে। অতএব পরবর্তী প্রজন্মের শ্রমিক পুনরুৎপাদনের দায়িত্ব পড়ল সেই গ্রামের ওপর, যেখানে সন্তান জন্ম দেওয়ার খরচ চালানো বেশ কঠিন। তাছাড়া শহরে কাজ করতে এসে যদি কোন শারীরিক বা মানসিক আঘাত–অসুস্থতা হয়, তা সারানোর দায়িত্বও পড়ে গ্রামাঞ্চলের ওপর।

২০০২ সালে হু জিনতাও এবং ওয়ে জিয়াবাও–এর নয়া নেতৃত্বে চীনা রাষ্ট্র অনেক সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলেছিল। কিন্তু চাকরি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত যেসব সামাজিক কর্মসূচি নেওয়া হল, তা সবই ছিল শহর বা গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য। এই এক পা গ্রামে এক পা শহরে রাখা চাষি–শ্রমিকরা এর বাইরে ছিল। গ্রাম থেকে আসা এই শ্রমিকদের জন্য একটা বিমা প্রকল্প চালু হয়েছিল। এর মধ্যে পেনশন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসাভাতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও বেকারভাতার মতো পাঁচটি বিষয় ছিল। কিন্তু এই প্রকল্পের সুবিধা তারাই পাবে, যাদের লিখিত শ্রমচুক্তি আছে। ২০০৬–এর স্টেট কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, ৪৬% অভিবাসী শ্রমিকের লিখিত শ্রমচুক্তি নেই এবং ৫১.৪% ঠিক সময়ে বেতন পায় না। নির্মাণ–শ্রমিকদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বেজিঙে এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৯০% নির্মাণ–শ্রমিকের লিখিত শ্রমচুক্তি নেই। কাজ করতে গিয়ে তারা অনেকে আঘাত পেয়েছে, কিন্তু কোনরকম ক্ষতিপূরণ পায়নি। ফলশ্রুতিতে পাওয়া যাচ্ছে, রাষ্ট্রের সুচতুর ও দক্ষ পরিচালনায় চীনা শ্রমিকদের নতুন প্রজন্মের এক অসমাপ্ত সর্বহারাকরণ।

চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রকের হিসেবে, শ্রমিকদের দলবদ্ধ আত্মহত্যার চেষ্টা, রাস্তা অবরোধ ও অন্যান্য আইন অমান্যের চেষ্টার মধ্য দিয়ে যেসব গণবিক্ষোভ ও গণআন্দোলনের ঘটনা ঘটে চলেছে, তার সংখ্যা ১৯৯৩–এ ছিল ৮৭০০টি, ২০০৫–এ তা দশগুণ বেড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭০০০টি। বেসরকারি মতে, ছোটোখাটো স্বতঃস্ফূর্ত আচমকা ধর্মঘট বাদ দিয়েও গুয়াঙদঙ প্রদেশে পার্ল নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে যেসব কারখানাগুলো আছে, ২০০৭ সালে বছরের প্রতিদিন সেখানে একটা অন্তত ধর্মঘটের ঘটনা ঘটেছে, যাতে কমপক্ষে এক হাজার শ্রমিক অংশ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে শেনঝেন শিল্পাঞ্চলের এক জার্মান ইলেকট্রনিক কোম্পানিতে ২০০৭ সালের এক ধর্মঘটকে একটু কাছ থেকে দেখা যেতে পারে।

২০০৭–এর জার্মান কারখানার ধর্মঘট

'ক' কারখানা চলে জার্মান পুঁজিতে। এখানে মোবাইল ফোনের তার, ব্যাটারি এবং অন্যান্য অংশ বানানো হয়। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর এর দুটো কারখানা গড়ে ওঠে শেনঝেনের দুই বড়ো শহরে। এই কোম্পানিতে ৮০০০ শ্রমিক কাজ করে। এদের ৮০ শতাংশই ১৮–৩০ বছর বয়সী মহিলা। শহরের অন্য কারখানার তুলনায় 'ক' কারখানায় মজুরি কিছু বেশি। প্রতি ঘন্টায় যে নিম্নতম মজুরি স্থির করা আছে এবং যেসব সামাজিক বিমা চালু আছে, তা এখানে মেনে চলা হয়। কারখানা চলে দুই শিফ্‌টে — সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যে ৬.৩০, মধ্যে ১ ঘন্টা টিফিন এবং রাত ৭টা থেকে পরদিন সকাল ৬.৪৫, মধ্যে ৪৫ মিনিট বিশ্রাম। সাধারণ শ্রমিকেরা সপ্তাহে ছ'দিন কাজ করে এবং মাসে ১০০০–১৪০০ ইউয়ান (১৫০–২০০ মার্কিন ডলারের সমান) মাইনে পায়।

এই কারখানায় সরাসরি উৎপাদনে যুক্ত শ্রমিকদের বলা হয় 'ইউয়ান গং' অর্থাৎ 'এমপ্লয়ি' আর ম্যানেজার, সুপারভাইজার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, অফিস ক্লার্ক ইত্যাদিদের বলা হয় 'ঝি ইউয়ান' অর্থাৎ 'স্টাফ'। বেশিরভাগ এমপ্লয়িরা কারখানার ডরমিটরিতে থাকে। আবাসনের এক–একটা ঘরে ৮ থেকে ১২ জন এমপ্লয়ি থাকে, তাদের মজুরি থেকে মাথা পিছু ৩০ ইউয়ান মাসিক ভাড়া হিসেবে কেটে নেওয়া হয়। স্টাফেদের কারখানার বাইরে থাকার জন্য মাসে ২০০ থেকে ৩০০ ইউয়ান হাউসরেন্ট অ্যালাউন্স দেওয়া হয়।

শেনঝেনে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে ৫৮০ ইউয়ান করা হয় এবং 'ক' কারখানায় তা চালু হয়। ২০০৬–এ আবার তা বাড়িয়ে ৭০০ ইউয়ান করা হলে সেটাও এখানে লাগু হয়। পরপর দু'বছর মজুরি বৃদ্ধির পরে 'ক'–এর কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে প্রোডাকশন কোটা বাড়িয়ে কাজের বোঝা বাড়িয়ে দিল। প্রতিদিন ১১ ঘন্টা কাজের সময়ের মধ্যে কোটা পূরণ না করতে পারলে শ্রমিকদের পরদিন ওই বাকি কাজটা তুলে দিতে 'অনুরোধ' জানানো হল। এর ফলে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে অনভিজ্ঞ শ্রমিকদের এবং প্রোডাকশন কোটা ঘোষণাকারী সুপারভাইজারদের সঙ্গে প্রোডাকশন লাইনের শ্রমিকদের বিরোধ দেখা দিল। অতএব কারখানায় অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল 'কম মজুরি' নয়, 'হাড় ভাঙা খাটুনি'। বহু শ্রমিক কারখানা ছাড়ল। কিন্তু বেশিরভাগ শ্রমিককেই কাজ ছাড়তে দেওয়া হল না; ছুটির দরখাস্তকারীদের একটা দীর্ঘ লাইন প্রায় সবসময় লেগে রইল। টেকনিশিয়ানরাও কম সংখ্যায় কাজে আসতে থাকল। ওদিকে শহর–প্রশাসনও আর মাইনে বাড়াতে চাইল না। শ্রমিকেরা ভেবে নিয়েছিল, ২০০৭–এ আগের দুই বছরের মতোই মাইনে বাড়বে। কিন্তু ১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার যখন তারা জুলাইয়ের মাইনে নিতে গেল, দেখল এক পয়সাও বাড়েনি। ওভারটাইমের ঘন্টা বেঁধে দেওয়ায় সুপারভাইজার ও টেকনিশিয়ানরাও দেখল, তাদের হাতে কম টাকা আসছে। ম্যানেজাররা শুধু দিনের শিফ্‌টেই কাজ করত। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় তারা কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি ওয়ার্কশপের নোটিশবোর্ডে একটা করে চিঠি সেঁটে দেওয়া হল। তাতে ওপরে লেখা ছিল, 'ঝি ইউয়ান এবং ইউয়ান গং–রা বলছি'। এতে বলা হল, ২০০৬–এর শেষ থেকেই কর্তৃপক্ষ মজুরি কমানোর চেষ্টা চালাচ্ছে এবং বর্তমানে তা ৫০% কমে গেছে। অথচ কাজের বোঝা এবং বাজারের খরচ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে ... আমাদের মজুরি বাড়াতে হবে ...।

আট দফা দাবিদাওয়ার মধ্যে একথাও ছিল, 'টেড ইউনিয়নগুলো সঠিকভাবে চালাতে হবে এবং নিচেরতলার ইউয়ান গং–দের এর পরিচালক সদস্যদের মধ্যে স্থান দিতে হবে'। চিঠির শেষে লেখা ছিল, 'কোম্পানি যেন এই চিঠির লিখিত জবাব দেয় এবং কোম্পানির প্রধান অফিসার সহ কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন মৌখিক জবাব গ্রহণ করা হবে না'।

পরদিন প্রচুর শ্রমিক, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা–শ্রমিকেরা জড়ো হওয়ার পর টেকনিশিয়ানরা ধর্মঘটী শ্রমিক–জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে শিল্পশহরের চৌমাথায় এসে হাজির হয়। সেখানে বেশি গাড়ি চলে না, রাস্তাটা তত ব্যস্ত নয়। পুলিশ এসে উপস্থিত হল। আধঘন্টা বাদে জনতা

ন্যাশনাল হাইওয়েতে গিয়ে রাস্তার অর্ধেক দখল করে নিল। শ'য়ে শ'য়ে পুলিশ পরিবেষ্টিত কারখানার ম্যানেজাররা, শ্রমদপ্তরের অফিসাররা এবং শহরের পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি সেখানে হাজির হল। তারা মুখে চোঙ লাগিয়ে ধর্মঘটীদের উদ্দেশ্যে বলল, কারখানায় ফিরে এসে তোমরা আপোষ-মীমাংসায় বসো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বেআইনি। শ্রমিকেরা আলোচনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করে দিক।

একদল শ্রমিক চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'আমরা সকলেই প্রতিনিধি', 'আমাদের কোন প্রতিনিধি নেই'।

অন্য শহরে 'ক' কারখানারই আর এক শাখায় ওই একই সময়ে ধর্মঘট হয়েছিল। ধর্মঘট দ্রুত ওই শিল্পশহরের অন্যান্য কারখানায় ছড়িয়ে পড়ল। স্টাফদের সঙ্গে শ্রমিকদের এই ঐক্য এবং একই সঙ্গে দুটো কারখানায় ধর্মঘটের ফলে কর্তৃপক্ষ সুপারভাইজারদের মাইনে ১০% এবং শ্রমিকদের মাইনে ৫% বাড়িয়ে দিল।

২০০৩-০৭ সময়কালে বারবার শ্রমিক-বিক্ষোভের ধাক্কাতেই মালিকেরা ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি ও শ্রম আইনের উন্নতি ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্দোলনের কোন সাংগঠনিক রূপ বা শক্তিশালী নেতৃত্ব ছিল না। শপফ্লোর বা উৎপাদনের জায়গাই ছিল শ্রমিক-জমায়েতের মূল জায়গা।

চীনে ১৯৯৪ সালে মোট বিচারাধীন শ্রম-বিরোধের সংখ্যা ছিল ১৯,০৯৮। ২০০৬ সালে তা রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩,১৭,১৬২; এতে জড়িত ছিল ৬,৭৯,৩১২ শ্রমিক। এই বিরোধের বেশিরভাগের বিষয় ছিল : মজুরি না দেওয়া, কম মজুরি দেওয়া, ওভারটাইমের পয়সা না দেওয়া, বেআইনিভাবে শ্রমনিয়োগপত্র না দেওয়া এবং সামাজিক বিমা ও অন্যান্য পরিষেবা না দিতে চাওয়া। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সমস্যা আরও বেড়েছে। ২০০৮-এর প্রথম ছ'মাসে শ্রম-বিরোধের সংখ্যা চঙকিঙে ১৪৫% এবং সাংহাইতে ৯২.৫% বেড়েছে; গুয়াঙদঙ প্রদেশে ২০০৭-এর তুলনায় ২০০৮-এ শ্রম-বিরোধ বেড়েছে ১৫৭.৭%, বেজিঙে ১০৪%।

রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূমিকা

শ্রম-বিরোধ ও বিক্ষোভের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার একটা নতুন আইনি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে। ক্ষমতাশালী কর্পোরেট সংস্থাগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শ্রমচুক্তি লাগু করতে হয়েছে। কিন্তু আইনত চুক্তি-ভুক্ত হওয়া এবং সত্যিকারের সুরক্ষা পাওয়ার মধ্যে এত ফারাক যে চীনা রাষ্ট্রের বৈধতাই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ১৯৮২ সালে সংবিধানে ধর্মঘটের অধিকার দিলেও তা এখনও চালু হয়নি। শ্রমিকদের অন্যান্য মৌলিক অধিকার, যেমন, সংগঠন গড়ে তোলা বা দলবদ্ধভাবে আপোষ-মীমাংসার বৈঠক করার অধিকার নেই। বাস্তবে সরকারি ইউনিয়নগুলির (যারা অল চায়না ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্গত) মালিকদের মোকাবিলা করার রাজনৈতিক বাধা আছে। ফলে শ্রমিকদের একা একা লড়তে হয়। দলবদ্ধ আপোষের অধিকার আছে একমাত্র ইউনিয়নের সদস্য অর্থাৎ পার্টির ক্যাডারদের। আসলে সরকারি ইউনিয়ন সরকারের বিরুদ্ধে তো কথা বলবেই না, বেসরকারি মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনেও কখনই সংগঠকের ভূমিকা নেবে না। ফলে চীন এখন এক নির্মম শ্রমিক শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র। 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকা ২০১০ সালের জুলাই মাসে লিখেছে, 'অভিবাসী চীনা শ্রমিকেরা এখনও খুব সস্তা। তাদের শ্রমের দাম আমেরিকার শ্রমিকদের শ্রমের দামের মাত্র ২.৭%; অন্যদিকে চীনে অবস্থিত কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা ১৯৭৮ থেকে ২০০৫ সালে ২০% বেড়ে গেছে (১৯৯৭-৯৮ বাদ দিয়ে)।'

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে ২০০৮-এর অক্টোবরে একমাত্র গুয়াঙদঙ প্রদেশেই ৮৫০০ প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল; ডিসেম্বরের মধ্যে রপ্তানি-শিল্পাঞ্চলের কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হল। কিন্তু অভিবাসী বা চাষি-শ্রমিকের শহরে কাজ করতে আসার স্রোতে ভাঁটা পড়ল না। চীনের ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস ২০১০ সালের মার্চ মাসের সমীক্ষায় জানায়, ২০০৯-এ অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ২৩ কোটি, আগের বছরের চেয়ে ১.৯% বেশি। এই শ্রমিকদের ৬১.৬%-এর বয়স ১৬ থেকে ৩০-এর মধ্যে।

আত্মহত্যা করে প্রতিবাদ : ফক্সকন কারখানার ঘটনা

১৯৭৪ সালে তাইপেই-তে তৈরি হয়েছিল ফক্সকন কোম্পানি। এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো এই ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি অ্যাপেল, ডেল, হিউলেট প্যাকার্ড, আইবিএম, সামসাঙ, নোকিয়া, হিতাচি সহ বিশাল সব কোম্পানির অর্ডার নিয়ে কম্পিউটার সহ বহুরকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার ৪০টি দেশে এদের কারখানা ও গবেষণাগার আছে আর দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে আছে এদের ২৫,০০০ পেটেন্ট। ২০১১ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক উৎপাদন ব্যবসার মোট আয়ের ৫০% এই ফক্সকনের কুক্ষিগত হবে। এই দানবীয় কোম্পানির শ্রমিকসংখ্যা ন'লক্ষ, যাদের মধ্যে ৮৫% হল অভিবাসী কম বয়সী শ্রমিক।

'ফক্সকন ব্র্যান্ড মানে হল তার শ্রমিক-শক্তির প্রতিভা' — এই গর্বোদ্ধত উচ্চারণ যারা করে, সম্প্রতি তাদের ১৩ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে। এদের বয়স ১৬ থেকে ২৫-এর মধ্যে। একজন বহুতল কারখানার ছাদ থেকে লাফাতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। বাকি ১২ জন ওইভাবেই লাফ মেরেছে। ৩ জনকে বাঁচানো গেছে, মারা গেছে ১০ জন। এই ঘটনাগুলি ঘটেছে ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে। এরা শেনঝেন শিল্পাঞ্চলের লঙহুয়া সাইটে কাজ করত। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের পর গ্রাম থেকে শহরে আসা এইসব তরুণ শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কে প্রত্যাশা তাদের বাপ-দাদাদের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু সেই প্রত্যাশা যখন ব্যর্থ হল, তারা তা সইয়ে নিতে পারেনি।

উনিশ বছরের লি হাই কোম্পানির ট্রেনিং সেন্টারের পাঁচতলার কার্নিস টপকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে মে মাসে। তার আগে আরও ১০ জন এভাবে ঝাঁপ দিয়েছে। তার সুইসাইড নোটে সে লিখেছে, "আমি আমার কাজের জায়গায় যতটা উন্নতি করব এবং যতটা ভালোভাবে নিজের পরিবারকে দেখতে পারব ভেবেছিলাম, তার চেয়ে আদতে অনেক কমই পেরেছি"। ১৯৯১ সালে হুনান প্রদেশের এক দরিদ্র গ্রামে লি-এর জন্ম। তাদের চার সদস্যের পরিবারের সামান্য আধ একর জমির ভাগ ছিল। ওর খুড়তুতো ভাই ওকে বলেছিল, ফক্সকনে গিয়ে কাজ করলে সে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। সেই কথা শুনে সে ৩০০ ইউয়ানে নিজের বাইকটা বেচে দিয়ে ট্রেনের টিকিট কেটে দক্ষিণে পাড়ি দেয়। শেনঝেন গুয়ানলান কারখানায় সে ৪২ দিন কাজ করেছিল। শোনা গেছে, প্রোডাকশন লাইনে প্রত্যেকদিনই সে সুপারভাইজারের প্রচণ্ড বকুনি খেয়েছে। আত্মহত্যার নোটে সে আরও লিখেছিল, "আমি আঁকতে ভালোবাসি, সিয়াও নামে মেয়েটাকে আমার খুব পছন্দ, আর সবচেয়ে অপছন্দ 'ফুশিকাঙ' [ফক্সকনের চীনা নাম]"। সদ্য স্কুল গ্রাজুয়েট লিয়ের কাছে ফক্সকনের জীবনধারার রঙিন ফানুস ফেটে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে এসে রোবটের মতো প্রোডাকশনের অ্যাসেম্বলি লাইনে অত্যন্ত দ্রুতগতির সেকেন্ড মাপা কাজে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। সে 'বড়ো' হতে চেয়েছিল। শেনঝেনের স্বপ্নপুরী তাকে 'বড়ো' হওয়ার সুযোগ দিতে পারেনি।

৬ মে ফক্সকনের শেনঝেন-লঙহুয়া বিল্ডিংয়ের ছ'তলা থেকে সপ্তম যে

তরুণ শ্রমিক আত্মহত্যা করে, তার নাম লু জিন। ২৪ বছর বয়সী লু জিনের বাড়ি হুনান প্রদেশেই। লি হাইয়ের মতোই গ্রামে তার পরিবারকে দেখার প্রয়োজন ছিল। ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট হওয়ার জন্য তার মাইনে ছিল সাধারণ শ্রমিকের দ্বিগুণ, ২০০০ ইউয়ান। যে আটমাস সে কাজ করেছিল, তাতে বাড়িতে সে মোট ১৩০০০ ইউয়ান পাঠাতে পেরেছিল। এর বেশিটাই জমেছিল ওভারটাইম করে। চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশনে লিয়ের ২৬ অক্টোবর ২০০৯-এর ব্লগে দেখা যাচ্ছে, সে লিখেছে, "আমি টাকার জন্য এই কোম্পানিতে এসেছি। আসার পরে বুঝলাম, এতে আমার জীবন আর ভবিষ্যত নষ্ট করা হচ্ছে। আমি বড়ো হয়েই প্রথম পদক্ষেপে ভুল পথে এগোলাম। আমি হতাশ।" লুকে তার পছন্দের গবেষণা বিভাগের বদলে প্রোডাকশন বিভাগে কাজ দেওয়া হয়েছিল। এপ্রিল মাসে সে প্রতিদিন রাত ন'টা পর্যন্ত কাজ করত। যদিও চীনা আইনে দিনে আট ঘন্টা, সপ্তাহে চল্লিশ ঘন্টা কাজ এবং দিনে সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা ওভারটাইমের কথা লেখা আছে। সে ১৪ মার্চ ২০১০ তার ব্লগে লিখেছিল, "যদি আমি পারতাম, তাহলে সত্যিই রোজ আমি গানের স্বরলিপি লিখতাম। আমার কাছে এমন টাকা নেই যা দিয়ে 'মিউজিক হার্ডওয়ার' কেনা যায়। আমি এমনকী একটা কম্পিউটার কিনেও পয়সা খরচ করতে চাই না। আমি কোন রেকর্ড কোম্পানিও খুঁজে পাই না। আমার যৌবন চলে যাচ্ছে, আমার চব্বিশটা বছর, আর কি আমি পারব?" লু গান ভালোবাসত, সে পেশাদার গায়ক হতে চেয়েছিল। কোম্পানি আয়োজিত গানের প্রতিযোগিতায় সে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। কিন্তু তাকে কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনে গিয়ে একঘেয়ে কাজ করতে হত। লুয়ের কাজ ছিল কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্থাৎ উৎপাদনের গুণমান বজায় রাখা। সে যদি তা না রাখতে পারত, তাহলে প্রোডাকশন লাইনের সমস্ত শ্রমিককে বকুনি খেতে হত। কিন্তু অ্যাসেম্বলি লাইনের কাজ খুব দ্রুত চলত। তার ভয় হত, এই বুঝি কাজ খারাপ হল, এই বুঝি শাস্তি হবে, মাইনে কাটবে। মে মাসের প্রথমদিকে সে খুবই ভেঙে পড়ে। তার মনে হত, কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে এবং খুন করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। আত্মহত্যার আগে তার নিদ্রাহীন রাতের বর্ণনা দিয়েছিল তার এক সহকর্মী, "লু বলেছিল, যাই একটু বাইরের দৃশ্য দেখে আসি। একথা বলতে বলতেই চট করে জানলা খুলে সে ব্যালকনিতে লাফিয়ে পড়ল, তারপর সেখান থেকে নিচে। ও এতটুকু ইতস্তত করেনি। আমি ওকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শুধু বাঁ হাতের জামার আস্তিনটা ধরতে পেরেছিলাম, ও ঝটকা মেরে আমার হাতটা সরিয়ে দিয়েছিল।"

লু আত্মহত্যা করার পাঁচদিন পর ন'তলা থেকে লাফ মেরে আত্মহত্যা করে ঝু চেনমিঙ। হেনান থেকে আসা এই মেয়েটারও বয়স ছিল ২৪ বছর। ওর বন্ধু বলেছিল, "এই পাঁচ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা মেয়েটার স্বপ্ন ছিল সুপার মডেল হওয়ার। ফক্সকনে ঢোকার আগে সে মডেলিং শিখেছিল। ওর ইচ্ছে ছিল দূর দেশে গিয়ে লেখাপড়া করবে। কিন্তু ১১ মে ২০১০ সন্ধ্যাবেলা তার মৃতদেহ কারখানার চত্বরে পড়ে রইল। তার নবীন জীবন থেকে সমস্ত গ্ল্যামার আর সৌন্দর্য তখন মুছে গেছে।"

শেনঝেন অঞ্চলের ন্যূনতম মজুরি অনুসারে ৩১ মে ২০১০ পর্যন্ত ফক্সকনের সাধারণ শ্রমিকেরা সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা শ্রমের জন্য মজুরি পেত সর্বোচ্চ ৯০০ ইউয়ান (১৩২ মার্কিন ডলারের সমান)। শ্রমিকদের পরপর আত্মহত্যার ঘটনার কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়ায় ফক্সকনের কর্পোরেট পরিচালকেরা ১ জুন থেকে তাদের মাইনে বাড়িয়ে ১২০০ ইউয়ান করে দিল। যদিও ১২০০ ইউয়ান মানে ওই বছরের আঞ্চলিক ন্যূনতম মজুরির মাত্র ৯% বেশি। অন্যদিকে তারা দেশের ভিতরদিকে, আরও সস্তায় যেখানে শ্রমিক পাওয়া যায়, সেখানে ব্যবসার বড়ো অংশ সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। তাদের পরিকল্পনা, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শেনঝেনের ফ্যাকট্রির শ্রমিক সংখ্যা ৩০% কমিয়ে দেওয়া। আর তাদের ব্যবসার জন্য চীন সরকার পশ্চিমে চঙকিঙ শহরে বিশাল খরচ করে শিল্পাঞ্চল গড়ে দিচ্ছে, যেখানে এক লক্ষ শ্রমিক শেনঝেন বা সাংহাইয়ের চেয়েও অনেক কম মজুরিতে কাজ করার জন্য অপেক্ষা করছে।

১০ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করার পর ফক্সকন সাধু-সন্ন্যাসীদের ডেকে এনে শ্রমিকদের আত্মার শান্তি এবং কারখানাকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। সাইকোলজিস্ট ডেকে এনে সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, 'ব্যক্তিগত কারণে' ওই শ্রমিকেরা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ১১, ১২ ও ১৩ নং ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ফক্সকনের হাত ধুয়ে ফেলার সমস্ত চেষ্টাকে বানচাল করে দিয়েছে।

ফক্সকনে শ্রমিকদের সামরিক কায়দায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শেনঝেন শিল্পাঞ্চলের লঙহুয়া কারখানায় ১০০০ সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে। সেখানে বাইরের লোক ঢোকা নিষেধ। শ্রমিকদের ধীরে ধীরে অথবা হালকা চালে হাঁটাও সেখানে বারণ। বাথরুম বা টিফিনে গেলেও শ্রমিকদের তল্লাশি করা হয়। সর্বত্র চেকপোস্ট আছে, সর্বদা নজরদারির ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকদের আটকে রাখা, গালাগালি দেওয়া, মারধোর করার অসংখ্য অভিযোগ আছে এখানকার সিকিউরিটি অফিসারদের বিরুদ্ধে। এইরকম পরিবেশে ১৬ জুলাই ২০০৯ আত্মহত্যা করেছিল সান ডানইয়ঙ নামে ২৫ বছরের এক কর্মী। হারবিন ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে পাশ করা এই গ্রাজুয়েট ছেলেটিকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অ্যাপেল-এর ফোর্থ জেনারেশন আই-ফোনের ১৬টি প্রোটোটাইপের একটি পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা সানই সরিয়েছে — এই সন্দেহে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, একলা ঘরে আটকে রাখা হয় এবং তার ঘর তল্লাশি করা হয়। তার বন্ধুদের অভিযোগ, সানকে গালাগালি এবং মারধোরও করা হয়েছিল। অপমানিত সান তার ঘরের বারোতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার আগে সে বন্ধুদের অনলাইন চ্যাটে বলেছিল, "কাল থেকে আমাকে কেউ আর গুঁতোগুঁতি করবে না, আমাকে আর বলির পাঁঠা করতে পারবে না, একথা ভেবে আমার বেশ স্বস্তি হচ্ছে।"

১৩ জনের আত্মহত্যার ঘটনার আগেই এই ঘটনা ঘটেছিল। ২০১০-এর জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে ১৩ জনের ঘটনার পরও গুয়াঙদঙ প্রদেশের ফোসান প্ল্যান্টে ২০ জুলাই এক ১৮ বছরের শিক্ষানবিশ শ্রমিক আত্মহত্যা করে, এরপর ৪ আগস্ট জিয়াঙসু প্রদেশের কুনশান কারখানার নিরাপত্তার বেড়াজাল টপকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে ২২ বছরের তরুণী লি ইউ। ১৮ আগস্ট শেনঝেন লঙহুয়া প্ল্যান্টের উদ্যোগে তরুণ শ্রমিকদের ভোলানোর জন্য একটা অনুষ্ঠান করা হয় ওখানকার এক স্টেডিয়ামে। সেখানে কিছু শ্রমিককে লাল রঙে 'আমি ফক্সকনকে ভালোবাসি' লেখা গোলাপী জামা পরিয়ে রাখা হয়েছিল। হঠাৎ এই অনুষ্ঠানে ২০,০০০ শ্রমিক উঠে দাঁড়িয়ে নানা শ্লোগান দিতে থাকে।

২৬ মে ২০১০ গাঙসু প্রদেশের বাইশ বছরের হি নামক শ্রমিক সাততলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। এই ঘটনার পর আর এক শ্রমিক তার ব্লগে লিখেছিল, "ফক্সকনের কর্মচারীরা, বিশেষত আমাদের মতো যারা গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকের কাজ করতে এসেছি, যাদের চীনে 'নঙমিন গং' বলা হয়, তাদের কাছে তো মৃত্যুই একমাত্র উপায়, যা দিয়ে প্রমাণ করা যায়, আমরা আদৌ বেঁচেছিলাম এবং যখন বেঁচেছিলাম তখন হতাশা ছাড়া আমাদের আর কিছুই ছিল না।"

মাওবাদ–মাও চিন্তাধারা — কিছু কথা

তমাল ভৌমিক

ভূমিকা

১৯৭০ সালে কলকাতা শহরের বড়ো রাস্তা থেকে অলিগলি সর্বত্র স্টেনসিলে আঁকা মাও সেতুঙের টুপি পরা মুখের ছবিতে দেওয়ালগুলো ছয়লাপ। সেইসময় অনেক রকম স্লোগানের সাথে সাথে এই দুটো শ্লোগানও চোখে পড়েছিল — 'পেন্টাগনকে দিচ্ছে নাড়া, মাও সেতুঙের চিন্তাধারা' আর 'মার্ক্সবাদ–লেনিনবাদ আজকের দিনের মাওবাদ'। এই স্লোগানগুলো যারা লিখেছিল, তারা ছিল নকশালপন্থী, সংক্ষেপে নকশাল। দু'বছর লেখাগুলো জ্বলজ্বল করেছিল। তারপর বছর তিনেকের এক অঘোষিত জরুরি অবস্থায় লেখাগুলো ফিকে হতে শুরু করে এবং ১৯৭৫–এর জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলোর জায়গা দখল করে কংগ্রেসিদের স্লোগান — 'কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই' ইত্যাদি বিশদফা সরকারি কর্মসূচির দাবিতে মহানগরীর দেওয়াল ভরে যায়।

নকশালদের সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থা, রাষ্ট্রীয় দমন–পীড়ন, হিংসা–প্রতিহিংসা–রক্তপাত — সেই ইতিহাসের যারা সাক্ষী তারা আজ সরাসরি দেখতে পাচ্ছে কোনও পন্থাকে গলা টিপে শেষ করে দেওয়া যায় না। সে অন্যস্বরে জেগে ওঠে। কেন? সমস্যা থেকে যাওয়া বা পথ খুঁজে না পাওয়ার তাড়না, কিসের জন্য? — সে বিচারে যাব না। শুধু আমরা যারা পঞ্চাশোর্ধ তারা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের খিড়কির দুয়োরে গুলিখাওয়া নকশালবাদ আজ চার দশক পরে দূরে বা কাছের জঙ্গলে মাওবাদ হয়ে পালটা গুলি চালাচ্ছে। আর পুরনো রাষ্ট্র পুরনো কায়দায় আবার তাদের নিকেশ করে দেওয়ার ঘুঁটি সাজাচ্ছে।

এরকম একটা অবস্থায়, পুরনো ওই স্লোগান দুটো নতুন করে একটা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে — 'মাওবাদ' বা 'মাও সে তুং চিন্তাধারা'। এই শব্দ এবং শব্দবন্ধদুটো একই জিনিস বোঝাচ্ছে না আলাদা জিনিস এবং এই জিনিসগুলো কী তা নিয়ে দু–চার কথা এই মুহূর্তে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে না হওয়াতেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

শুরু করার আগে আরেকটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে 'মাওবাদ' সম্পর্কে এই আলোচনায় মাওপন্থী নেতা ও সংগঠনের পাশাপাশি অন্যান্য চিন্তাভাবনার ব্যক্তিদের মতামতকেও একইসঙ্গে রাখা হয়েছে। এখানে মাওপন্থী নেতা ও সংগঠন মানে সেইসব কম্যুনিস্ট নেতা ও সংগঠন যারা মতাদর্শ হিসেবে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ও মাওবাদকে একইসঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার নেতাদের চোখে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা

১৯৪২ সালে যখন শুদ্ধিকরণের আন্দোলন চলছিল, তখন মার্ক্সবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে চীনা বিপ্লবের বিশেষ প্রয়োগের সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য মাও সে তুং–কে মহান বিপ্লবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন চৌ–এনলাই, লিউ শাউচি এবং চু–তে।

১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই, চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ২২ তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে লিউ শাউচি তাঁর রিপোর্টে পার্টি সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন — "চীনা বিপ্লবের ওপর এবং অন্যান্য বিষয়ে মাও সে তুঙের তত্ত্ব তাদেরকে মনোযোগ সহকারে অবশ্যই পড়তে হবে। কমরেড মাও সেতুঙের চিন্তাধারা এবং তার আদর্শনৈতিক তন্ত্রে নিজেদের সশস্ত্র করে তুলতে হবে, যাতে তারা পার্টির মধ্যে মেনশেভিক চিন্তাধারার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে।"

১৯৪৫–এর এপ্রিলে, চীনা পার্টির ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নে, পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম বর্ধিত প্লেনারি অধিবেশনে, যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, তাতে দেখা যায়, "১৯২১ সালের জন্মলগ্ন থেকেই চীনা কম্যুনিস্ট দল তাদের কাজের নীতি হিসেবে চীনা বিপ্লবের বিশেষ প্রয়োগকে মার্ক্সবাদ–লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্যের সঙ্গে একত্রে যুক্ত করছে এবং চীনের বিপ্লবে কমরেড মাও সে তুঙের তত্ত্ব ও প্রয়োগই হচ্ছে ওই একত্ররূপ।"

কিন্তু 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা' — এই ধারণা এই শব্দবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় যখন ১৯৪৫–এর মে মাসে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে লিউ শাউচি বলেন, "মাও সেতুঙ চিন্তাধারার মানে হল, আমাদের সময়ে, একটা ঔপনিবেশিক, আধা–ঔপনিবেশিক ও আধা–সামন্ততান্ত্রিক দেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মার্ক্সবাদের ধারাবাহিকতা ও তার বিকাশ; এটা হল একটা নির্দিষ্ট জাতীয় চরিত্রে মার্ক্সবাদের হাতে কলমে প্রয়োগের একটা চমৎকার রূপ।" এই সময়েই 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা' কথাটা পার্টির সংবিধানেও গৃহীত হয়।

১৯৪৭–এর ফেব্রুয়ারিতে ইয়েনানে মার্কিন সাংবাদিক আনা লুই স্ট্রং–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিউ শাউচি বলেন, "মাও সেতুঙের বড়ো অবদান হল এই যে তিনি মার্ক্সবাদকে তার ইউরোপীয়ান আকার থেকে এশিয়ান আকারে পরিণত করেছেন।..." পরে ১৯৪৯–এর ৭ মে প্রথম সারা চীন যুব কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টে চৌ–এন–লাই বললেন, "বিশ্বজনীন সত্যকে চীনের বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করার যে বিশেষ প্রকৃতি তাই নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে মাও সেতুঙ চিন্তাধারার মধ্যে।"

অথচ, ১৯৪২ সালে যখন ইয়েনানে শুদ্ধিকরণের আন্দোলন চলছে, তখনই পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি পরিচালিত পার্টির স্কুলে, ছাত্রদের সঙ্গে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা প্রসঙ্গে আলোচনায় মাও সেতুঙ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা তাঁর নিজের চিন্তাধারা নয় এবং "এই চিন্তাধারা লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের অক্ষরে লেখা, আর চীনা জনগণ ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির যে সম্মিলিত প্রজ্ঞা, তারই প্রতিনিধিত্ব করছে এই চিন্তাধারা।" তিনি আরও বলেন, "আমার নিজস্ব চিন্তাধারা এখনও বিকশিত হচ্ছে এবং আমিও ভুল করতে পারি।" একই রকমের আরেকটা ঘটনা লক্ষ্য করা যাক : ১৯৪৮ সালের আগস্টে উত্তর চীন বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করতে গিয়ে, উ ইউঝাং, তাঁর বক্তৃতায় 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা'র পরিবর্তে 'মাও সেতুঙবাদ' ব্যবহার করা যায় কি না জানতে চেয়ে টেলিগ্রাম পাঠান। এর উত্তরে মাও জানান, "এই কথাটা সবচাইতে অনুপযুক্ত। মাও সেতুঙবাদ বলে কিছু নেই। ব্যাপারটা এমন নয় যে 'প্রধানতঃ মাও সেতুঙবাদ পড়তে হবে।' বরং ছাত্রদের এই কথাটা জানানো জরুরি যে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্ব এবং চীনা বিপ্লবের অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে।"

অর্থাৎ, আমরা দেখলাম, 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা' বলে একটা আলাদা বিশিষ্ট চিন্তাধারা মার্ক্সবাদ–লেনিনবাদ–এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক — এরকমটা মাও সেতুঙ ব্যক্তিগতভাবে নিজে না চাইলেও, চীনা কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে ও চীনা কম্যুনিস্ট আন্দোলনে মাও–চিন্তাধারা চল্লিশের দশকেই ওরকম একটা বিশিষ্ট আসন দখল করে নিয়েছে।

তাহলে 'মাও–চিন্তাধারা' বলতে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ও বিশেষত মাও সে তুং–এর দ্বিধাটা কোথায়? এর একটা উত্তর পাওয়া যায় 'দলের মধ্যে

বুর্জোয়া ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো' নামক একটা লেখায়। ১৯৫৩ সালের ১২ আগস্ট এই রচনাটিতে মাও সেতুঙ লিখেছেন, "সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় প্লেনারি সেশনে কতকগুলো নিয়ম গৃহীত হয়েছিল যেগুলো তখন প্রস্তাবে লেখা হয় নি। প্রথমতঃ জন্মদিন পালনে নিষেধ ... ষষ্ঠ নিষেধ হল, মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিনদের সঙ্গে চীনা কমরেডদের একই আসনে বসানো যাবে না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শিক্ষকের সাথে ছাত্রের মতো এবং সেরকমটাই হওয়া উচিত। এই সমস্ত নিয়মগুলো পালন করাই সত্যিকারের বিনয়।"

এখানে বোঝা যাচ্ছে যে ওই দ্বিধার উৎস বিনয়। আর এই বিনয় রক্ষা করেই যা বলা যায়, তা পাওয়া যাচ্ছে আরো পাঁচ বছর পরে, ১৯৫৭-র ৯ অক্টোবরে মাও সেতুঙের লেখা 'বিপ্লবকে উন্নীত করার কর্মী হয়ে ওঠো'-তে, যখন সদ্যোজাত মুক্ত চীনের টলোমলো পা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে শিখে গিয়েছে। এখানে মাও বলছেন, "সর্বহারাকে সবসময় সাহায্য করে গেছে একদল বুদ্ধিজীবী। তাঁদের প্রথম জন হলেন মার্ক্স, তারপর ছিলেন এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন এবং এখন আমাদের মতো কিছু লোক এবং আরো অন্যরা। সর্বহারা হচ্ছে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা শ্রেণী এবং তার নেতৃত্বে সারা দুনিয়ায় বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে।"

এর পরেও আমরা দেখতে পাই যে গোড়ার দিকে মাও চিন্তাধারাকে লিউ শাওচি ও চৌ-এনলাই যেমন চীনের বিশেষ ক্ষেত্রে ফলিত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হিসেবে দেখেছেন পরবর্তী নেতা বা চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠন, তা মূলত একই রেখে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে 'অতি বামপন্থী' বলে সমালোচিত লিন পিয়াও বা 'দক্ষিণপন্থী' বলে সমালোচিত তেং শিয়াওপিং মূলত একই কথা বলেছেন। ১৯৬৯ সালের ১ এপ্রিল চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে লিন পিয়াও প্রদত্ত রিপোর্টে যা লেখা হয়েছে তাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে মাও সে তুং-এর চিন্তাধারাকে আগের মতোই চীনের বিশেষ ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-এর বিশেষ প্রয়োগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন লিন পিয়াও সহ চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং তার সাথে যোগ করেছেন মাও-এর অবদান হিসেবে আরও দুটো বিষয়কে : প্রথম, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্ব আর দ্বিতীয়, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী চরিত্র ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তাকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির জিলিন দেশাদেশিক কমিটির স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক মিটিং-এ ১৯৭৮-এর ১৬ সেপ্টেম্বর তেং শিয়াওপিং মাও চিন্তাধারা বিষয়ে যে বক্তব্য রাখেন তা পরে তাঁর সংগৃহিত রচনাবলীতে এই নামে প্রকাশিত হয়, — 'মাও সেতুঙের পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরো এবং তথ্য থেকে সত্য অনুসন্ধানের নীতিকে আঁকড়ে ধরো।' এই লেখায় তেং বলছেন, "মাও সেতুঙ চিন্তাধারার প্রথম কথা হল, তথ্য থেকে সত্য খুঁজে বার করা এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্যকে চীনা বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে মেলানো।..." একই সময়ে 'চার মূল নীতিকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরো' লেখায় তেং শিয়াওপিং বলেন, "আমরা আমাদের কাজের পথ প্রদর্শক হিসেবে ধারাবাহিকভাবে মার্ক্স-লেনিনের মতবাদ এবং মাও সেতুঙের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছি, এটাকে এভাবেও বলা যায় যে ওঁদের মতবাদের মধ্যে দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, আমরা তাকেই গ্রহণ করেছি। এটাকে এভাবেও বলা যায় যে ওঁদের মতবাদের মধ্যে দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, আমরা তাকেই গ্রহণ করেছি।..." পরবর্তীকালে ১৯৮০-র ২১-২৩ আগস্ট ইতালিয়ান সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্যালসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এবং '৮০-'৮১-তে 'চীনা গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে পার্টির ইতিহাসের কতকগুলো প্রশ্ন সম্পর্কে প্রস্তাব' শীর্ষক আলোচনায় তেং শিয়াও পিং মাও সেতুঙের 'সামনের দিকে লম্বা লাফ' (গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড) ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচির সমালোচনার পাশাপাশি এটাও বলেছেন, "এটা কমরেড মাও সেতুঙের একার বিচ্যুতি নয়। আগের প্রজন্মের প্রবীন বিপ্লবীদের, এমনকী আমাকেও এর জন্য দায়ী করা উচিত..." ইত্যাদি। আমরা দেখলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে, কিছু সমালোচনা বাদ দিলে, তেং শিয়াও পিং মাও সেতুঙ চিন্তাধারার নতুন কোনও দিক হাজির করেননি। বরং তাকে চীনের মূর্ত পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মূর্ত প্রয়োগ রূপেই দেখেছেন, যেভাবে আগে চৌ-এন-লাই লিউ শাউচি ইত্যাদিরা দেখেছেন।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার নেতারা যেভাবে মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে দেখেছেন, তার ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে মতাদর্শের ক্ষেত্রে তারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ধারাবাহিকতায় মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে একই আসনে বসালেও মাওবাদ শব্দটাকে ব্যবহার করেননি। অন্যান্য লেখা থেকে জানা যায় যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গোড়ার দিকে রেডগার্ড বাহিনীতে নাম লিখিয়ে স্কুল-কলেজের ব্যাপক সংখ্যক ছেলেমেয়ে যারা কারখানা ও খনিতে শ্রমিকদের মধ্যে ও গ্রামে গিয়ে চাষিদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল তারা রেডবুক ও বিগ পোস্টার সহ মাওবাদ শব্দটারও যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিল। এই প্রসঙ্গে, ১৯৬৬ সালে বার্কলে থেকে প্রকাশিত ফ্রানজ শুরম্যানের লেখা 'ইডিওলজি অ্যান্ড অর্গানাইজেশন ইন কম্যুনিস্ট চায়না' বইটা থেকে একটা মন্তব্য দিয়ে শেষ করব : "চীনা কম্যুনিস্টদের শব্দকোষে মাওবাদ বলে কোনও শব্দ নেই।"

'মাওবাদ' এবং 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা' এই দুটি শব্দ নিয়ে কচকচি করার এমনিতে কোনও দরকারই নেই। কিন্তু মাওবাদীদের অনেকেই মনে করেন যে এই বিষয় দুটো আলাদা। নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'দি ওয়ার্কার'-এর মে ২০০৬ সংখ্যায় দেখা যায় 'প্রলেতারিয়ান পার্টি অফ ইস্টবেঙ্গল' (পিবিএসপি)র মহম্মদ শাহিন বলেছেন, "এটা খুবই পরিষ্কার যে আমাদের আজকের মতাদর্শগত লাইন হল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। আগে এটা ছিল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা। ১৯৯২ সালে আমাদের পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা পালটে মাওবাদ করা হয়। ... মতাদর্শগত লাইনের প্রশ্নে আজকের আমাদের পার্টির বোঝাপড়াটা এরকম যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে গ্রহণ করার অর্থ হল, বিশেষত মাওবাদকে গ্রহণ করা ... মাওবাদ হচ্ছে সর্বহারার সহিংস বিপ্লবের নীতি তার মানে সর্বহারার সশস্ত্র বিপ্লব। মাওবাদকে এইভাবে গ্রহণ না করার অর্থ হল সংশোধনবাদের রাস্তা ধরা।" প্রায় একই সুরে ওই পত্রিকাতেই সিপিআইএমএল, নকশালবাড়ির অজিথ যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার নামই হচ্ছে, 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা একই জিনিস নয়'। এই প্রবন্ধের বক্তব্য হল, "... মাও সেতুঙ চিন্তাধারার পরিবর্তে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ এই শব্দাবলী ব্যবহার করার অর্থ হলো আরো নির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করে মাওয়ের অবদানকে সুনিশ্চিত করা। আধুনিক সংশোধনবাদের সঙ্গে সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা টানার জন্যও এটা জরুরি। ... রেভলিউশনারি ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট বা আরআইএম এবং তার সদস্যরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করছে যে "মাও সেতুঙ তাঁর জনযুদ্ধের তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে সর্বহারার সামরিক বিজ্ঞানকে বিকশিত করে এক সুসঙ্গত রূপ দিয়েছেন" এবং এটা ... "সার্বজনীনভাবে সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যদিও প্রত্যেক দেশের বিশেষ অবস্থা বিচার করেই এর প্রয়োগ করা উচিত।" তাছাড়া সামরিক সংগঠন থাকাটাও মাওবাদী

সংগঠনগুলোর একটা চারিত্রিক লক্ষণ এরকম একটা ইশারা পাওয়া যাচ্ছে। যদিও এর কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

আরআইএম নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৪ সালে। পেরু, কলম্বিয়া, হাইতি, ইরান, ইতালি, তুর্কি, ব্রিটেন, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল সহ বেশ কিছু দেশের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী দল এই সংস্থার সদস্য। আমাদের দেশের মাওবাদীদের যে সবচেয়ে বড়ো সংগঠন, যাদের মূল ঘাঁটি দান্তেওয়াড়ায়, তারা ওই সংস্থার সদস্য কি না জানি না, তবে তাঁদের মুখপত্র গোপালজী ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির আলপা শাহকে যে ইন্টারভিউ দিয়েছেন (২০১০-এর ৮ মে সংখ্যায়) তাতে বলেছেন, 'আমাদের আদর্শ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ'। অর্থাৎ এমন সিদ্ধান্ত আমরা টানতেই পারি যে চল্লিশ বছর আগে যে মাও চিন্তাধারা গ্রহণ তখনকার সংশোধনবাদীদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সীমারেখা টেনে দিত আজ তা মাওবাদ রূপে ওই একই কাজ করে চলেছে। এখানে অবশ্যই সংশোধনবাদী ও বিপ্লবী বলতে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদেরই দুই অংশ যাদেরকে সাধারণভাবে ডান অংশ ও বাম অংশ ভাবা হয়ে থাকে তাদের কথাই বলা হচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কি মাওবাদ ও মাও চিন্তাধারা — এই দুইয়ের মধ্যে একটা তফাতও আছে। বাংলাদেশের যে পিবিএসপি দলের মহম্মদ শাহিনের লেখার কথা খানিক আগে বলেছি, তাদেরই দলের আনোয়ার কবির ওই একই পত্রিকার (দি ওয়ার্কার) একই সংখ্যায় মাওবাদের মতাদর্শগত ভিত্তির আলোচনা লিখছেন, "সমস্যাটার মূল রয়েছে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের সৃষ্টিশীল প্রয়োগের ভিতরে। এই ব্যাপারে লেনিন অনেক আগেই বলে গেছেন যে মার্ক্সবাদ কোনও যান্ত্রিক বিষয় নয়, এটা কর্মের দিক নির্দেশক। মাও, তার দার্শনিক অবদানের মধ্যে দিয়ে এই তত্ত্বকে আরো গভীরে নিয়ে গেছেন।" এই যে 'তত্ত্বকে গভীরে নিয়ে যাওয়া' বা 'দার্শনিক অবদান' এগুলোই একটা চিন্তাধারাকে সার্বজনীন মতবাদের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার যুক্তি যোগায়। মাও সে তুঙের ক্ষেত্রে সত্যিই সেরকমটা হয়েছে কি না সেই বিচারে এখনই না গিয়েও আমরা বুঝতে পারি মাও চিন্তাধারার প্রবক্তা ও মাওবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে তফাৎটা কোথায়।

যাই হোক এখন দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের অর্থাৎ মাওবাদীদের যুগ। দেশে দেশে মাওবাদীদের পন্থার ফারাক রয়েছে। যেমন, দশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি একবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের আস্বাদ গ্রহণ করেছে, আবার ভারতের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এখন পর্যন্ত জঙ্গলের ঘাঁটি এলাকাতেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছে। এরকম নানা পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের মতাদর্শগত মিল রয়েছে — যার প্রধান কথা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। আরেকটা উল্লেখযোগ্য মিল হল, ভারতীয় মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি গণপতি ও নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান প্রচণ্ড দুজনেই তাদের বক্তব্যে (দি ওয়ার্কার, ১০ মে ২০০৬ দ্রষ্টব্য) পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের আরও বিকাশের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কতটা তাঁরা তাদের কর্মসূচিতে ধরতে পারছেন তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। যেমন, ভারতীয় মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে এরকম প্রশ্ন তুলেছেন তিলক দাশগুপ্ত, তাঁর 'ভারতে মাওবাদ' লেখায় যা প্রকাশিত হয়েছে 'ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি'র ২২ জুলাই ২০০৬ সংখ্যায়। সেখানে তিনি মাওবাদীদের সম্পর্কে লিখেছেন,"এবং আরও তাত্ত্বিক স্তরে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জটিল ভারতীয় বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারার মতো কর্মসূচি এবং রণনৈতিক ও কৌশলগত লাইন তাদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাটা তাদের কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হওয়া দরকার ..." ইত্যাদি। এখান থেকে দুটো আলোচনার বিষয় উঠে আসতে পারে — এক, মাওবাদীরা কতটা মাওবাদী; এবং দুই, আজকের দিনের সমস্যা সমাধানে মাওবাদ কতখানি কার্যকরী। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এই সবটা আলোচনার কোনও অবকাশ নেই। আমরা শুধু মাওবাদকেই খানিক বোঝার চেষ্টা করব।

মাওবাদ — কেমন মতাদর্শ

১৯৭৬ সালে মাও সেতুঙের মৃত্যুর পরে হুয়া কুয়ো ফেং ও পরে ১৯৭৭-এ তেং শিয়াওপিং ক্ষমতায় আসেন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চার বড়ো নেতা যাঁদের 'চার চক্রী' বলা হয়, তাঁদের গ্রেপ্তার করে তখনই বিচার শুরু হয়। এই ঘটনাকে চার্লস বেটেলহেম 'গ্রেট লিপ ব্যাকওয়ার্ড' বলে সমালোচনা করেন। সারা পৃথিবী জুড়ে কম্যুনিস্টদের মধ্যে তখন রব ওঠে যে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পথ ছেড়ে সংশোধনবাদের পথ ধরেছে এবং মাও সেতুঙের নেতৃত্বে যে সমস্ত সঠিকপন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা উলটে দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ করে এতবড়ো পরিবর্তন হয় না। কাজেই এর থেকে এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, মাও সে তুঙের মৃত্যুর আগে থেকেই 'ওই বেঠিক পন্থা' গ্রহণের রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। অন্যান্য সমস্ত তথ্য খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে ১৯৬৬ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ড শুরু করাটাই ছিল মাওয়ের সরাসরি নেতৃত্ব দিয়ে করা শেষ বড়ো কাজ। মাওয়ের প্রধান প্রধান লেখা বা বক্তব্যগুলো সব ১৯৬৬ সালের আগেই রচিত। পরবর্তীকালে মাওয়ের ব্যক্তিগত ডাক্তার ডাঃ লি ঝি সুই ছাড়াও অনেকের লেখা থেকেই জানা যায় যে মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে থেকে মাও বেশ জরাগ্রস্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমালোচনা করতে গিয়ে তেং শিয়াওপিং বলেছেন, "... ওই বছরগুলোতে মাও সেতুঙের আসলে আগের মতো আর চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষমতা ছিল না এবং তাঁর কিছু বক্তব্য পরস্পরবিরোধী ..." ইত্যাদি। এই সূত্র ধরে আমরা ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে মাওয়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখা 'চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ' ও 'হুনানে কৃষক আন্দোলনের সমীক্ষার রিপোর্ট' থেকে শুরু করে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মাও সেতুঙের রচনাবলীকে মাওবাদের তাত্ত্বিক বুনিয়াদের লিখিত রূপ বলতে পারি।

মাওবাদ কেমন মতাদর্শ তা যেমন ওই রচনাবলী থেকে পাওয়া যেতে পারে তেমনই তৎকালীন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির বিভিন্ন লেখাপত্রেও ওই মতাদর্শের একটা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এইরকমভাবে সবটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন ফ্রানজ শুরম্যান। এই সমাজবিদ্যা বিশারদের বই 'ইডিওলজি অ্যান্ড অর্গানাইজেশন ইন কম্যুনিস্ট চায়না'র উল্লেখ আগেই করেছি। বাংলায় এই বইটার নাম দাঁড়ায় 'কম্যুনিস্ট চীনের মতাদর্শ ও সংগঠন'। এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'ইডিওলজি' বা 'মতাদর্শ'। এই অধ্যায় থেকেই বড়ো একটা অংশ তুলে ধরে আলোচনা করব। কেন, তার একটা কারণ এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলেছি। দ্বিতীয় কারণ হল, মাওবাদ সম্পর্কে বর্তমান মাওবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু আভাস 'মাওবাদ বনাম মাও চিন্তাধারা' উপশিরোনামে এবং মাও চিন্তাধারার প্রবক্তাদের বিচারে মাওবাদী মতাদর্শের কিছু ইঙ্গিত 'চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার নেতাদের চোখে মাও চিন্তাধারা' উপশিরোনামে দিয়েছি। এগুলো আভাস-ইঙ্গিতে সারা ছাড়া এই ক্ষুদ্র পরিসরে আর কিছু সম্ভবও নয়। তৃতীয় কারণ, বর্তমান নিবন্ধকারের মনে হয়েছে, প্রথাগত মার্ক্সবাদী না হলেও

ফ্রানজ শুরম্যান বিষয়টাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিবেচনা করেছেন এবং প্রধান কম্যুনিস্ট ধারার বাইরে থেকে দেখার ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে কোনও বাধ্যবাধকতা তেমন খর্ব করেনি। যদিও পশ্চিমি শিক্ষার ছাপ তার স্বাভাবিক চিন্তাকে কোথাও সংকীর্ণ করেনি এমনটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এছাড়া শুরম্যান সমাজবিদ্যায় বিশারদ হিসেবে সুপরিচিত এবং চীন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমেরিকার ডান ও বামপন্থী, উভয় মহলই তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছে।

শুরম্যানের বক্তব্য

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির মতাদর্শ হল আধুনিক পৃথিবীর সব মহান সাংগঠনিক মতাদর্শগুলোর অন্যতম। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির চার দশকেরও বেশি সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় যে মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়ননে বিকশিত হওয়া ধারণাগুলোকে মৌলিক ভিত্তি করে পার্টি একগুচ্ছ ধারণাকে প্রণালীবদ্ধ রূপ দিয়ে নিজেদের মতাদর্শ গড়ে তুলেছে এবং তাকে ব্যবহার করেছে নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আর নিজেদের লক্ষ্য সাধন করার জন্য।

এখন আমরা দেখব চীনা কম্যুনিস্টরা তাদের মতাদর্শকে কী আখ্যা দিয়েছে। সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের (এপ্রিল–জুন ১৯৪৫) পার্টি নিয়মাবলীর ভূমিকায় বলা হয়েছে : "চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের সমস্ত কর্মের দিশা হিসেবে মার্ক্সবাদী–লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের ব্যবহারিক প্রয়োগের যে ঐক্যবদ্ধ চিন্তাধারা সেই মাও সেতুঙের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছে।" এর প্রতিতুলনায় অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬) পার্টি নিয়মাবলীর ভূমিকায় বলা হচ্ছে : 'চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের সমস্ত কর্মের দিশা হিসেবে মার্ক্সবাদ–লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের ব্যবহারিক প্রয়োগের যে ঐক্যবদ্ধ চিন্তাধারা, মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে গ্রহণ করছে। (মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ) এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগ রেখেও চীনা কম্যুনিস্টরা ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি ওই দুইয়ের মধ্যে ফারাকও টেনেছে। মার্ক্সবাদকে ধরা হয়েছে 'বিশ্ববীক্ষা' (চীনা ভাষায় 'সি চিহে–কুয়ান' ও জার্মান ভাষায় 'ভেলটানজাং') হিসেবে। লেনিনবাদকে ধরা হয়েছে বিপ্লব ও সংগঠনের নীতি হিসেবে। ১৯৫০–এর দশকের শেষ দিক থেকে, ১৯৪৫–এর পার্টি নিয়মাবলীতে প্রথম যার উল্লেখ করা হয় সেই 'মার্ক্সবাদ–লেনিনবাদ–মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে' আরও জোরের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব ১৯৫০–এর দশকের মাঝামাঝি লেনিনবাদের যে মতাদর্শগত ভূমিকা ধার্য করা হল সেই একই ভূমিকা নির্দ্বিধায় ধার্য করা হয়েছে 'মাও সেতুঙের চিন্তাধারা' সম্পর্কে। যাই হোক, এখনকার আলোচনায় এটা গুরুত্বপূর্ণ যে চীনা কম্যুনিস্টরা তাদের ঘোষিত নীতিতে সবসময়েই মতাদর্শের গোটা অবয়বটিকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করেছে।

বিশ্ববীক্ষা কোনও ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দিতে পারে, কিন্তু তার কর্মকাণ্ড কোন পথে যাওয়া ইচিত তার দিকনির্দেশ নাও করতে পারে। কিন্তু বিপ্লব ও তার সংগঠনের নীতির কিছু কর্মসূচি থাকে। আমরা তাই ধরে নেব যে চীনা কম্যুনিস্ট মতাদর্শের প্রধান দুটো অংশ পূর্বে উল্লিখিত বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক মতাদর্শের ধারণার সমার্থক; মতাদর্শের একটা অংশ বিশুদ্ধ ও অন্য অংশ ব্যবহারিক। এদেরকে আমরা বিশুদ্ধ মতাদর্শ ও ব্যবহারিক মতাদর্শ বলব।

চীনা কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়েও এই তফাৎ সংগঠনের মতাদর্শের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আমাদের একটা সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া উচিত। বিশুদ্ধ মতাদর্শ হচ্ছে এমন একগুচ্ছ ধারণা যা কোনও ব্যক্তিকে একটা সম্মিলিত সচেতন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী দান করে, ব্যবহারিক মতাদর্শ হচ্ছে এমন একগুচ্ছ ধারণা যা ওই ব্যক্তিকে বাস্তব কাজকর্ম করার সচেতন হাতিয়ার যোগায়। এই তফাৎটা বোঝার জন্য আমরা মার্ক্সবাদী মতাদর্শে পরিচালিত একটা সংগঠনকে উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি। এই সংগঠনের সদস্যরা এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের মূল হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম। এই দৃষ্টিভঙ্গী তাদেরকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জটিলতা ও তার বাস্তবতাকে একটা নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে সাহায্য করবে। যাই হোক, এটা তাদের প্রায়োগিক পথের কোনও দিক নির্দেশ করবে না। যদি এই সংগঠনটি এখন এর মতাদর্শের সাথে পার্টির অগ্রবর্তী বাহিনীর লেনিনীয় নীতি সংযুক্ত করে তাহলে সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের একটা উপায় পাওয়া যায়।

চীনা কম্যুনিস্ট মতাদর্শ নিয়ে বিশেষ আলোচনায় যাওয়ার আগে, আমরা বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক মতাদর্শের তফাতের সাধারণ তাৎপর্য নিয়ে কয়েকটা কথা সেরে নিই। বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক মতাদর্শের মধ্যে তফাৎ থাকলেও এদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। বিশুদ্ধ মতাদর্শকে বাদ দিলে ব্যবহারিক মতাদর্শের ধারণাগুলোর কোনও বৈধতা থাকে না। কিন্তু ব্যবহারিক মতাদর্শ ব্যাতিরেকে একটা সংগঠন তার বিশ্ববীক্ষাকে ধারাবাহিক ক্রিয়াকলাপে পরিণত করতে পারে না। যদিও সকল বিপ্লবী আন্দোলনের অবশ্যই একটি মতাদর্শ থাকতে হয়, তবু তাদের সকলেই এমন ব্যবহারিক মতাদর্শের উদ্ভাবন করতে পারেনি যার মাধ্যমে কার্যকরী সংগঠন গড়ে তোলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, জাতিয়তাবাদী আন্দোলনগুলো একমাত্র বিশুদ্ধ মতাদর্শের জন্ম দিতে চায়, যদিও তারা তাদের সদস্যদেরকে এই পৃথিবীতে পরিচিতির একটা বোধ দিতে চায়, তারা কিন্তু তাদের সদস্যদেরকে কর্মসূচী গ্রহণের কোনও যুক্তিসঙ্গত উপায় দিতে পারে না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো তাই তাদের সাংগঠনিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে উদারতাবাদী বা প্রাচীনপন্থী হয়ে পড়ে। যদিও এই সাংগঠনিক পদ্ধতিগুলো প্রায়ই সংগঠন গড়া ও ব্যবহার করার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে, তবুও সেগুলো, কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনভাবে একটা ব্যবহারিক মতাদর্শের চেহারা গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর বহুক্ষেত্রে গুরুতর সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা যায়।

সমসাময়িক বাস্তবতার সমস্যাগুলিতে মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রয়োগে সাংগঠনিক নীতিগুলীর প্রণয়নের মাধ্যমে লেনিন পৃথিবীর কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী আন্দোলনগুলো গড়ে তোলার জন্য একটা ব্যবহারিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চীনা কম্যুনিস্টরা আরো এগিয়ে গেছেন। লেনিনবাদের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু নিজেদের দীর্ঘ বিপ্লবী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে, একটা ব্যবহারিক মতাদর্শ আরও বিকাশ ঘটানোর মধ্যে দিয়ে।

আমাদের ধারণায় যাকে বলছি বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক মতাদর্শ, চীনা কম্যুনিস্টদের ভাষায় তা হল 'তত্ত্ব' ও 'চিন্তাধারা'। তত্ত্ব হচ্ছে বিশুদ্ধ মতাদর্শ আর চিন্তাধারা ব্যবহারিক মতাদর্শ।

আমাদের অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও সংকলিত নীতিমালা প্রকাশিত হয়নি যাকে মাও সেতুঙের চিন্তাধারা বলে লেবেল সাঁটা হয়েছে। যদিও চীনা কম্যুনিস্টরা তাঁর চারখণ্ড নির্বাচিত রচনাবলী প্রকাশ করেছে, কিন্তু সেগুলো নীতির কোনও স্থিরীকৃত কায়া গড়ে তোলেনি। কারণ মাওয়ের যে লেখাগুলো নির্বাচিত রচনাবলীতে স্থান পায় নি তারও অনেকগুলোকে আলাদা করে নানা সময়ে প্রধান মতাদর্শের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হত, মাও সেতুঙ চিন্তাধারা কী, তাহলে তাকে বলতে হত যে এটা কোনও নীতিগুচ্ছ নয়; বরং এটা একটা চিন্তাপ্রক্রিয়া যা অনেকগুলো ধারণার প্রণালীবদ্ধরূপে

প্রকাশিত হয়েছে। এইসব ক্রম পরিবর্তনশীল ও ক্রম প্রসারণশীল ধারণাগুলো যেগুলো মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের একটা স্থিরীকৃত তত্ত্ব থেকে আহরণ করা হয়েছে, সেগুলো থেকেই গড়ে উঠেছে মাও সেতুঙের চিন্তাধারা।

তত্ত্ব (লিলুন) এবং চিন্তাধারা (জুসিয়াং) এই দুটো শব্দের চীনা কম্যুনিস্ট মতাদর্শে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ... তত্ত্ব শব্দটির মতাদর্শগত তাৎপর্যের ক্রমবিকাশ কীভাবে হয়েছে বোঝা যায়, এই শব্দটাকেই ব্যবহার করে মাও সেতুঙের একটা মন্তব্যের দুটো সময়ের দুটো প্রকাশভঙ্গীমায়, মূল লেখাটা ১৯৪২ সালে ইয়েনান পার্টি স্কুলে এক বক্তৃতায় মাও সেতুঙ বলেন, "মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে সেই তত্ত্ব যা মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন সৃষ্টি করেছেন বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে। এবং এর সাধারণ সিদ্ধান্তগুলো আহরণ করা হয়েছে ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী অভিজ্ঞতাগুলো থেকে। আমরা যদি এই তত্ত্বকে শুধু পাঠ করি এবং ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক বাস্তবতায় গবেষণার জন্য একে বুনিয়াদী হিসেবে ব্যবহার না করি, যদি চীনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরিখে একটা তত্ত্বকে গড়ে না তুলি, একটা তত্ত্ব যেটা আমাদের নিজস্ব যেটার একটা বিশেষ ধর্ম থাকবে, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক বলাটা একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা হয়ে দাঁড়ায়।"

সংশোধিত মন্তব্যে তলায় দাগ দেওয়া লাইনটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে, যার প্রকাশ ঘটেছে তার নির্বাচিত রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে। ১৯৪২-এর প্রকাশনায় মাও এমন একটা তত্ত্বের প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন, 'যেটা আমাদের নিজস্ব, যেটার একটা বিশেষ ধর্ম থাকবে'। ১৯৫৩ সালে নিশ্চয়ই এই বাক্যটাকে 'বেঠিক' ভাবা হয়েছিল। এইভাবে দেখলে, তত্ত্ব শব্দটি ইতিমধ্যে এমন একটা মতাদর্শগত তাৎপর্য অর্জন করল, যে পরবর্তী প্রকাশনায় তাকে ছেঁটে ফেলতে হল।

১৯৬৪ সালের ৩ আগস্ট প্রকাশিত 'জেনমিন জিফাও'-এর সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে মতবাদ হিসেবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সেতুঙ চিন্তাধারার একটা সংজ্ঞা পাওয়া যেতে পারে : "দার্শনিক মতাদর্শের বিচারে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মূল হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, বিশেষত বিপরীতের ঐক্যের সূত্র। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে এটা শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব, বিশেষত সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কতন্ত্রের তত্ত্ব। প্রকৃত মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্যই বিপরীতের ঐক্যের সূত্র প্রয়োগ করবে, অবশ্যই সবসময় সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বকে ঊর্ধে তুলে ধরবে ... মাও সেতুঙের চিন্তাধারা হচ্ছে এমন, যা, সাম্রাজ্যবাদের পতন ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগে, চীনা জনগণের মহান বিপ্লবী সংগ্রামে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্যকে যুক্ত করেছে চীনে বিপ্লবের প্রয়োগের এবং নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এবং সৃষ্টিশীলভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ ঘটিয়ে। আমাদের সর্বহারা বিপ্লবী উত্তরাধিকারীদের অবশ্যই প্রকৃত মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী হতে হবে এবং সেই রূপে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে ও অক্লান্তভাবে মাও সেতুঙের রচনাবলী পড়তে হবে, মাও সেতুঙের চিন্তাধারাকে সক্রিয়ভাবে শিখতে হবে ও সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।"

এটা আমরা আগেই দেখিয়েছি যে এখন চীনা কম্যুনিস্টরা তাদের গোটা মতাদর্শকে দুটো প্রধান অংশে ভাগ করে দেখে : মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সেতুঙের চিন্তাধারা। ওপরের অনুচ্ছেদে বিপরীতের ঐক্যের সূত্র এবং শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সার হিসেবে দেখানো হয়েছে। ধারণাগুলোর ফলশ্রুতিতে কর্ম বা অ্যাকশন নিয়ে আমরা যে আলোচনা করেছি, তার সাথে সম্পর্ক আছে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে 'সূত্র' ও 'তত্ত্ব'র ফারাক টানার মধ্যে। অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা আছে বিপরীতের ঐক্যের সূত্রকে অবশ্যই সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহার করতে হবে। আমরা অবশ্যই দেখতে পাই, মার্কসবাদ থেকে গৃহীত দ্বন্দ্বের তত্ত্ব, বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক মতাদর্শের যোগসূত্রের কেন্দ্রিয় ধারণার সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বই হচ্ছে চীনা কম্যুনিস্টদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর মূলবস্তু।

যেহেতু মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙের চিন্তাধারার নৈতিক সংজ্ঞা হিসেবে 'জেনমিন জিফাও'-এর সম্পাদকীয়র উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটাকে ধরা যেতে পারে, তাই এই লেখাটার বিষয়ে মন্তব্য করাও যায়। অনুচ্ছেদটাতে মাও সে তুং-এর চিন্তাধারাকে বর্ননা করা হয়েছে এমন হিসেবে, 'যা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্যকে চীনে বিপ্লবের প্রয়োগ ও নির্মাণের সাথে যুক্ত করেছে। এই বাক্যটাকে বলা যেতে পারে যে এটা মতাদর্শ সৃষ্টির মৌলিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিচ্ছে। এর মানে দাঁড়ায় যে, প্রথমে সার্বজনীন সত্য ছিল, দ্বিতীয়ত মূর্ত প্রয়োগও ছিল যে প্রয়োগের সঙ্গে সার্বজনীন সত্যর সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, এবং তৃতীয়তঃ ছিল মাও সেতুঙের সক্রিয় মন যা ওই দুইয়ের সংযোগ ঘটিয়ে তত্ত্ব সৃষ্টি করে। এইভাবে দেখলে, মতাদর্শ জন্ম নেয় বাস্তব সমস্যায় সত্যের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং সার্বজনীন তত্ত্বকে (বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য যার প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে) মূর্ত প্রয়োগের (সত্যের সাহায্যে যার নির্ণয় সম্ভব হতে পারে বা নাও হতে পারে) সঙ্গে যুক্ত করে। তাই মাওয়ের জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে মতাদর্শ (বা জ্ঞান) হচ্ছে কর্ম বা 'অ্যাকশন'-এর থেকে উৎপন্ন এবং উল্টোটা নয়।

মাওয়ের কাছে তত্ত্ব সৃষ্টি একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার সিদ্ধান্ত আগে থেকে দেখা যায় না। তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সংযুক্তি চলতে চলতে তা চিন্তাধারার সঙ্গে নতুন কিছুকে যুক্ত করে। নতুন বিপ্লবী প্রজন্মকে, মাও সেতুঙের চিন্তাধারা পাঠ করার চেয়েও বেশি করে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয়, এটাকে (মাও চিন্তা) তত্ত্ব ও প্রয়োগের মিলন ঘটানোর একটা আদর্শ উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে এবং সেই জন্য এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে যাতে প্রতিদিনকার জীবনযাপন ও ক্রিয়াকর্মে মতাদর্শ একটা কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

এই সমস্ত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে, যদিও মাও কোনও বিশুদ্ধ মতাদর্শ সৃষ্টি করেননি, তাঁকে আবার ব্যবহারিক মতাদর্শ সৃষ্টির কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে, এটাই দুনিয়াতে তাঁর অবদান।

দ্বন্দ্ব তত্ত্ব

আমরা এবার মাও সেতুঙের চিন্তাধারার কেন্দ্রীয় ধারণ দ্বন্দ্ব তত্ত্বকে দেখব। মাও সে তুং-এর লেখা প্রধান দুটো দার্শনিক রচনা হল 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' এবং 'প্রয়োগ প্রসঙ্গে' নামক একজোড়া প্রবন্ধ। এই যে একজোড়া প্রবন্ধের উল্লেখ সাধারণত একসাথেই করা হয়, এতে বোঝা যায় যে চীনা কম্যুনিস্ট মতাদর্শে দ্বন্দ্ব প্রবণতা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। দ্বন্দের যে ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে, তাও বিবেচ্য। এই প্রবণতা, যাকে রীতিমাফিক বলা হয়, 'বিপরীতের ঐক্যের নীতি', এটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই বিশেষ তত্ত্ব যাকে ব্যবহারিক মতাদর্শ গ্রহণ করেছে বিশুদ্ধ মতাদর্শর সাধারণ তত্ত্বাবলী থেকে। এটাই মাও সেতুঙের চিন্তাধারার তথা চীনা কম্যুনিস্টদের ব্যবহারিক মতাদর্শের সার। এর ব্যবহারিক কার্যকারিতা নির্দেশ দেওয়া আছে 'জেনমিন জিফাও'-এর এক মন্তব্যে : 'প্রকৃত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী অবশ্যই সমস্যা সমাধানের জন্য বিপরীতের ঐক্যের সূত্র প্রয়োগ করবে।'

জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সঠিক মীমাংসার সমস্যা প্রসঙ্গে রচনায় মাও সেতুঙ দু'রকম দ্বন্দ্বর কথা বলেছেন : 'আমাদের ও শত্রুর মধ্যকার দ্বন্দ্ব,

যা বৈরি দ্বন্দ্ব' আর 'জনগণের মধ্যকার' দ্বন্দ্ব যা হচ্ছে 'অবৈরী দ্বন্দ্ব'। বিপরীতের ঐক্যের সূত্র প্রথমটার ক্ষেত্রে খাটে না — আগেই হোক বা পরে হোক, শত্রুদের ধ্বংস করতে হবে এবং 'আমাদের' মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ঐ সূত্র প্রযোজ্য — শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বৈরি দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা যায়।

চীনা সমাজ সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক ধারণা

মাও সেতুঙের চিন্তাধারা, যেমনটা আমরা আগে বলেছি, একগুচ্ছ নীতিমালা নয়, বরং একটা চিন্তা প্রক্রিয়া, যা ব্যবহারিক মতাদর্শ হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য। মতাদর্শর কাঠামোকে খুলে ফেলার পর আমরা এখন এই চিন্তা প্রক্রিয়াকে সরাসরি পরীক্ষা করতে পারি। যেহেতু মাও সেতুঙের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে 'তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংযোজন'–এর মধ্যে দিয়ে আমরা এটাকে বিমূর্তভাবে বর্ণনা করতে পারি না, পারি বাস্তব সমস্যার সাথে সংযুক্ত করে।

১৯৫৮ সালে কম্যুনিস্ট চীনের নেতারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সামাজিক উন্নয়েনের এক উচ্চাকাঙ্খী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এর নাম 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' বা 'সামনের দিকে লম্বা লাফ'। এর উদ্দেশ্য চীনকে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে, তার পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে উন্নীত করে একটা আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করা। এই 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' যত না একটা পরিকল্পনার ফল, তারও চেয়ে বেশি একটা দৃষ্টিভঙ্গী বা বীক্ষণের ফল। পরিকল্পনা হচ্ছে একটা সতর্কভাবে ছক কষা, কিছু ক্রিয়াকর্মর ব্লু–প্রিন্ট যার ভিত্তি হচ্ছে কিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং সামর্থ্য। বীক্ষণ হচ্ছে একটা পরিস্থিতির আন্তঃসম্পর্কের সার সম্পর্কে একটা সামগ্রিক অন্তর্দৃষ্টি। ১৯৫৬–৫৭ সালে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চীনে করা হয়েছিল, সে পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৮–১৯৬২ চলার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৫৭–র শেষাশেষি সেই পরিকল্পনা বাতিল করে, চীনা সমাজ সম্পর্কে মাও সেতুঙের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তি করে এই নতুন কর্মসূচি গৃহীত হয়। ...

মাও সেতুঙের চীনা সমাজ সম্পর্কে এই বীক্ষণ তাঁর চিন্তা–প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত। এই চিন্তা–প্রক্রিয়া প্রয়োগে তৎকালীন বিশ্ব ইতিহাস মাওয়ের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সংগ্রাম যা আমরা আগেই বলেছি। চীনা বাস্তবতায় ওই চিন্তার প্রয়োগই চীনা সমাজ সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক ধারণার জন্ম দিয়েছে। যেহেতু 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' এই ধারণা থেকেই গড়ে উঠেছে, এটাকে কম্যুনিস্ট চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে মতাদর্শর প্রয়োগের সবচাইতে মাহেন্দ্রক্ষণের উদাহরণ হিসেবে ধরা উচিত।

... আমরা চেষ্টা করব মাওয়ের এই বীক্ষণের পুনর্নির্মাণ করতে। ... আমাদের পুনর্নির্মাণে থাকবে প্রথমত মাওয়ের দুটো বক্তব্য এবং দ্বিতীয়ত যারা 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' কর্মসূচিকে প্রস্তুত ও লাগু করেছিল এমন মানুষদের লেখা ও কাজে মাওয়ের চিন্তার যে প্রতিফলন পড়ছে সেগুলো। মাওয়ের বক্তব্য দুটো হল : ১৯৫৬–র এপ্রিলে বলা, 'দশটি প্রধান সম্পর্ক প্রসঙ্গে' এবং ১৯৫৭–র ফেব্রুয়ারিতে বলা 'জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সম্পর্ক প্রসঙ্গে'... আমাদের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু পাওয়া যেতে পারে 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড'–এর পলিসিগুলো থেকে, আর ১৯৫০–এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে, যে লেখায় চীনা সমাজের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নিষ্ঠা সহ আলোচনা করা হয়েছে।

মাওয়ের বীক্ষণের দুটো প্রধান চাবিকাঠি হল, দ্বন্দ্বের পরিচয় এবং দ্বন্দ্বর সমাধান। ১৯৫৭–র ফেব্রুয়ারিতে রাখা বক্তব্যর শুরুর অংশ থেকে আমরা একটা উদ্ধৃতি দিয়ে দ্বন্দ্বর পরিচয়ের উদাহরণ দেখাব (যেটাকে আমরা পরে ভূমিকা বলে উল্লেখ করব) :

"আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে রয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, কৃষকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক এই দুইয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, একদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ এবং অপরদিকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেনীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের সরকার হল এমন একটা সরকার যা সত্যিকারভাবে জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ও জনগণের সেবা করে। তবুও সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে কোনও না কোনও দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই ধরণের দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে রাষ্ট্রস্বার্থ ও যৌথস্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব, গণতন্ত্রের সঙ্গে কেন্দ্রিকতার দ্বন্দ্ব, নেতার এবং তার অনুসরণকারীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থার কিছু কর্মচারীর আমলাতান্ত্রিকতার সঙ্গে জনসাধারণের দ্বন্দ্ব। এটাও জনসাধারণের মধ্যকার একটা দ্বন্দ্ব। সাধারণভাবে বলতে গেলে, জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলোর মূলে রয়েছে জনগণের স্বার্থের মৌলিক ঐক্য।"

গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের সময়কার একটা পলিসি বা কার্যনীতি বাস্তবে কীভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখব দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান কীভাবে ঘটছে। একটা এমন উদাহরণ হচ্ছে, 'তিনের সংযুক্তি আন্দোলন'। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাডার, প্রযুক্তিবিদ, এবং শ্রমিকদেরকে একটা ওয়র্ক টিমে বা কর্মীদলে ঐক্যবদ্ধ করাদ। ক্যাডাররা নেতা, প্রযুক্তিবিদরা বুদ্ধিজীবী আর শ্রমিকরা জনগণ। মাওয়ের বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আছে। তিনের সংযুক্তি আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে পার্টি চাইছে দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান করে একটা বিপরীতের ঐক্য গড়ে তুলত। এই তিনকে শুধু একসঙ্গে রাখলেই সমাধান হবে না, বরং আশা করা হচ্ছে প্রত্যেকে অপর হবে : শ্রমিক প্রযুক্তিবিদ হল, প্রযুক্তিবিদ হল শ্রমিক এবং উভয়েই ক্যাডারদের সঙ্গে নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করল। এইভাবে তিনের সংযুক্তি আন্দোলন হল এমন একটা উদাহরণ যার মধ্যে দিয়ে উপরোক্ত উদ্ধৃতির রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বর সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে।

মাও সেতুঙ যে দৃষ্টিতে চীনা সমাজকে দেখেছেন, তার ফলে যে প্রধান দ্বন্দ্বগুলো দেখা গিয়েছে, সেগুলোর সমাধানের একটাই বড়ো কর্মসূচী হাজির হয়েছিল, গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড। এটা ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রের সর্বত্র একইসাথে প্রযোজ্য একটা সার্বিক কর্মসূচি। এর চালিকাশক্তি ছিল মতাদর্শ। ...

এইরকম চিন্তাপ্রক্রিয়ার যেটা অসাধারণত্ব সেটা হল এর সরলতা। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের কতকগুলো মৌলিক দার্শনিক প্রতিজ্ঞাকে গ্রহণ করে, এই চিন্তাধারা এগিয়ে যায় কতগুলো অনিঃশেষ দ্বৈততাকে সংযুক্ত করার দিকে। একটা ধারণাকে একটা মতাদর্শগত চিন্তাধারায় বিষয়ীভূত করার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে ব্যবহারিক বাস্তবতার সঙ্গে তার পরিষ্কার সংযোগ আছে; যদি তাই হয় তাহলে মতাদর্শগত চিন্তাধারা ঘটনাক্রমে এর বাস্তব দ্বান্দ্বিক প্রতিপক্ষকে খুঁজে বের করবে। যদি এই দ্বৈততা একটা দ্বন্দ্বে পরিণত হয় তাহলে মতাদর্শগত চিন্তাধারা আরও এগিয়ে গিয়ে কোন ধরণের সমাধান সম্ভব তা বিবেচনা করবে।

এইভাবে, যেখানে চীনা কম্যুনিস্টদের বিশুদ্ধ মতাদর্শ হল কতগুলো স্থির সার্বজনীন ধারণা, সেখানে তাদের ব্যবহারিক মতাদর্শ হল কতগুলো চিরপরিবর্তনশীল চিরপ্রসারণক্ষম নির্দিষ্ট ধারণাগুচ্ছ, যেগুলোর উদ্ভব হয়েছে মূর্ত সমস্যার সঙ্গে মতাদর্শগত চিন্তাধারার দ্বান্দ্বিক সংযুক্তির মধ্যে দিয়ে। এরকম কতকগুলো সংযুক্তি যদি ভুল বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়, তাতে খুব কিছু তফাৎ হয় না, যেহেতু এই ধরনের চিন্তাভাবনা যা সৃষ্টি হচ্ছে তা

খুবই নির্দিষ্ট, সার্বজনীন কোনও ধারণা নয়। চিন্তাধারার প্রক্রিয়াই সবসময় সার্বজনীন ও সত্য, এবং এর নির্দিষ্ট সৃষ্টি আবশ্যিকভাবে সার্বজনীন ও সত্য নয়।

শেষ করার আগে

শুরম্যানের বক্তব্য যা দাঁড়াল তাতে মাও কোনও বিশুদ্ধ মতাদর্শ সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টি করেছেন এক ব্যবহারিক মতাদর্শ যা আবার চির পরিবর্তনশীল–চির প্রসারণক্ষম নির্দিষ্ট ধারণার গুচ্ছ। এর সাথে যদি অন্য দুটো বক্তব্যকে মিলিয়ে নিই — এক, বর্তমান মাওপন্থীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন আর আই এম এর বক্তব্য : 'এটা সার্বজনীনভাবে সব দেশেই প্রযোজ্য, যদিও প্রত্যেক দেশের বিশেষ অবস্থা বিচার করেই এর প্রয়োগ করা উচিত' এবং দুই প্রাক্তনদের প্রতিনিধি হিসেবে চৌ এনলাইয়ের ১৯৪৯ সালের বক্তব্য 'বিশ্বজনীন সত্যকে চীনের বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করার যে বিশেষ প্রকৃতি তাই নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে মাও সে তুং চিন্তাধারার মধ্যে' — তাহলে দেখা যায় যে গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে মাওবাদ নির্দিষ্ট বা বিশেষ ধারণার গুচ্ছ হয়েই আছে। কারো মতে মাওয়ের ১৯৩৭ সালে লেখা 'অনুশীলন প্রসঙ্গে' ও 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' অনেক পরিমাণে আই সিকির ১৯৩৪ সালে লেখা দাঝং ঝেকসু অর্থাৎ 'জনগণের জন্য দর্শন' থেকে নেওয়া; কারো কারো মতে, তাঁর বিপরীতের ঐক্যের সূত্রের পিছনে এঙ্গেলস ও হেগেল রয়েছে — এইসব বিতর্কিত প্রশ্ন তুলে মাওয়ের দার্শনিক অবদানের মৌলিকত্ব খুঁজে বার করার কোনও দরকার নেই। বিশেষ ধারণাগুচ্ছকে সার্বজনীন মতাদর্শে পরিণত না করলেও মাও সেতুঙের চিন্তাধারা মাওবাদ হতে পারে। চিন্তাধারা লেখাপত্র–বই–দলিলে থাকে, আর সেই চিন্তাধারা মোতাবেক কিছু করার পন্থা বানালে তা 'বাদ' হয়ে যায়। একথা মনে হয়, মার্ক্সবাদ–লেনিনবাদ সর্বক্ষেত্রেই খাটে। আসল প্রশ্ন হলো প্রয়োগের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে আছে ওই চিন্তাধারাকে কে কোন চোখে দেখছে তার ওপর, এবং এর আগে ওই চিন্তাধারার প্রয়োগ হয়ে থাকলে তার ফলাফল বিচারের ওপর। এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটাকে নিয়ে একটা আলোচনা হল, যা শেষ হল বলার কোনও কারণ নেই।

তথ্যসূত্র :

১) Beijing Review No. 21, May 26, 1980.
২) Beijing Review No. 9, March 2, 1981.
৩) Beijing Review No. 16, April 19, 1982.
৪) Vol V, Selected works of Mao Tse Tung, Foreign Language Press, Peking, First Edition 1977.
৫) Mao Zedong Biography -- Assesment -- Reminiscences Compiled by Zhong Wenxian, Foreign Language Press, Britain, First Edition 1986.
৬) Long Live Mao Tse Tung Thought by Dr. W. C. Deb, June, 1986, Progressive Publishers, New Delhi
৭) চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির নবম জাতীয় কংগ্রেস, প্রকাশক, শ্রাবনী বুক সেন্টার, কলকাতা ৯, আগস্ট ১৯৮৯।
৮) চীনা গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পার্টির ইতিহাসের কতকগুলো প্রশ্ন সম্পর্কে প্রস্তাব, বিদেশি ভাষা প্রকাশনালয়, বেইজিং, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১।
৯) ছয়টি দার্শনিক প্রবন্ধ, মাও সেতুঙ, নিউ বুক সেন্টার, কলকাতা ৯, আগস্ট ১৯৮৫।
১০) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 6, Published : London & NewYork (1998).
১১) Ideology and Organisation in Communist China --- by Franz Schurmann, Berkley, University of Califirnia Press, 1966.
১২) The Worker, Organ of the Communist Party of Nepal (Maoist), May 2006, 19th Special Issue.
১৩) Economic and Political Weekly, July 22, 2006.
১৪) Economic and Political Weekly, May 8, 2010.
১৫) History of the Chinese Communist Party, A chronology of Events (1919-1990), 1991, Foreign Language Press, Beijing.

প্রতিবেদন

নির্দলীয়তা থেকে ক্ষমতা–মুক্তি প্রবাহে

জিতেন নন্দী

আলাপচারিতার বিষয় ছিল 'নির্দলীয়তা'। গতবছর প্রথম বৈঠক ছিল রাঁচীতে। এবছর সকলে মিলিত হয়েছিল এলাহাবাদের স্বরাজ বিদ্যাপীঠে। ব্যক্তিগতভাবে আমি রাঁচীতে উপস্থিত হতে পারিনি, এবছর যোগ দিয়েছিলাম এই আলাপচারিতায়।

দল, দলীয়তা এবং আমাদের চারপাশে 'দলবাজি'বলে যে ছবি তৈরি হয়েছে, সেটার এক পশ্চিমবঙ্গীয় রঙ–রূপ আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, অন্য রাজ্যে, এমনকী পৃথিবীর দেশে দেশে 'দল' আজ বিচার–বিমর্ষের এক সার্বজনীন বিষয় হয়ে উঠেছে। এলাহাবাদের বিষয়টা এল বিপরীত দিক থেকে : নির্দলীয়তা।

স্বরাজ বিদ্যাপীঠ, যেখানে আমাদের এই আলাপ চলল দু'দিন ধরে, সেখানে রয়েছে 'আজাদি বাঁচাও আন্দোলন'–এর সদর দপ্তর। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা বর্ষীয়ান বনোয়ারী লাল শর্মা। তাঁর যে সহকর্মী আমাদের সঙ্গে ওই দু'দিন সবসময় ছিলেন, আমাদের থাকাখাওয়ার তদারকি করলেন, তিনি মনোজ ত্যাগী। পঞ্চাশোর্ধ এই কর্মী ছাত্রাবস্থায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়তে পড়তে যুক্ত হয়ে যান আন্দোলনে। এখন তিনি এই 'আজাদি বাঁচাও আন্দোলন'–এর সর্বক্ষণের কর্মী। সেপ্টেম্বর মাসের ওই সময়টায় ক'দিন পরেই 'অযোধ্যা' নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রকাশের কথা ছিল। তা নিয়ে উত্তেজনাও ছিল ওখানে। মনোজ ত্যাগী, বনোয়ারিজী ছাড়াও আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরও দুই স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী (ওঁদের পত্রিকা 'ইতিহাসবোধ') লাল বাহাদুর বর্মা ও অংশু মালবীয় সম্প্রদায়গত শান্তিরক্ষার কাজে ওইসময় ব্যস্ত ছিলেন। এঁরা ছিলেন আমাদের এই বৈঠকের স্থানীয় উদ্যোক্তা।

আলাপচারিতায় অংশগ্রহণকারী চল্লিশজন এসেছিলেন এলাহাবাদ ছাড়াও রাঁচী, জামশেদপুর, লক্ষ্ণৌ, জব্বলপুর, নাগপুর, থানে, পাঞ্জাব, দিল্লি, কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এঁরা সকলেই সামাজিক–রাজনৈতিক কর্মী এবং এই পারস্পরিক সংলাপে বিশেষভাবে উৎসাহী। রাঁচীতে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের বাইরেও বেশ কয়েকজন এবার

প্রথম অংশ নিলেন। তাই প্রথমেই রাঁচীর আলোচনার একটা বিবরণ গোড়াতে লিখিতভাবে হিন্দিতে পেশ করা হল। মৌখিকভাবে জনমুক্তি সংঘর্ষ বাহিনীর কর্মী মন্থন পয়েন্ট আকারে আগের আলোচনাটা মনে করিয়ে দিলেন। যতটুকু বোঝা গেল, রাঁচীর বৈঠকে দল বনাম নির্দলীয় সংগঠন, দুইয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও সীমাবদ্ধতা, কীভাবে দলের সমাপ্তি ঘটবে, জনগণের আন্দোলন ও তার প্রতিনিধিত্ব, পার্টি ও নির্দলীয় সংগঠনে ওপর থেকে নিচ 'ভার্টিকালিজম'–এর অস্তিত্ব নিয়ে কথা উঠেছিল। সেখানেই যোগীন ও আমরিন কিছু প্রশ্ন হাজির করেছিলেন : 'দলীয়তা তো শুধু দলেই থাকে না, সব জায়গাতেই রয়েছে। অন্যকে দাবিয়ে রাখার পরম্পরা তো সকলের মধ্যেই বিরাজমান, শ্রমিকের মধ্যেও রয়েছে। রাষ্ট্র কি শুধু আমাদের বাইরে? সে কি তার অনুস্তরে ভাইরাসের মতো অদৃশ্য রূপে সকলের ভিতরে, সব কিছুর ভিতরে বসে নেই? তাঁরা এই প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দ সিন্‌হার ১৯৭৪ সালের বই 'সমাজতন্ত্র ও ক্ষমতা'–র উল্লেখ করেন।

এই ধারাতেই এবারকার নির্দলীয়তা আলাপচারিতার পটভূমি তৈরি হয়েছিল। তবে এই আলাপচারিতার উদ্যোক্তা 'ছাত্র–যুব সংঘর্ষ বাহিনী' এবং 'জনমুক্তি সংঘর্ষ বাহিনী'–র পরিসরে কথাবার্তা, তর্ক আগেই শুরু হয়েছিল। এদের কর্মীবাহিনীর মধ্যে ১৯৮০–র দশক থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল : 'দলের প্রতি সমাজে যে বিতৃষ্ণা তৈরি হচ্ছে, দলের বিকল্প কী হতে পারে?' একদিকে ভাবনা ছিল, রাষ্ট্রীয় [সরকারি] ক্ষমতায় যাওয়া এবং তার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আনতে হবে। অন্যদিকে উঠছিল 'জনগণের নিজস্ব ক্ষমতা'–র কথা। ১৯৮৮–৮৯ নাগাদ একটা মঞ্চ গড়ে উঠেছিল — 'জনআন্দোলন সমন্বয় সমিতি'। তিনবছর চলেছিল সেই সংগঠন। এর মধ্যে অংশ নিয়েছিল সমতা সংগঠন, ছাত্র–যুব সংঘর্ষ বাহিনী, উত্তরবঙ্গ তফশিলি জাতি ও জনজাতি সংগঠন, কর্নাটকের দলিত সংঘর্ষ সমিতি, কেরালার একটি সংগঠন এবং মহারাষ্ট্রের যুব ক্রান্তি দল। এদের মধ্যে তর্ক চলতে চলতে অবশেষে 'দল'–এর প্রশ্নে মোর্চা ভেঙে গেল। কিন্তু জনমুক্তি সংঘর্ষ বাহিনী ও ছাত্র–যুব সংঘর্ষ বাহিনী 'নির্দলীয়তা নিয়ে বিচার–বিমর্ষ চালিয়ে যায়। নির্দলীয়তার পরিসরে কর্মীসুলভ সক্রিয়তা (activism) জনসাধারণের রায় নেওয়ার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি কী হবে, আদৌ কোন সংগঠন দরকার আছে কিনা — এইসব প্রশ্নের বিচারধারার সূত্রে ঘনিয়ে উঠেছিল এলাহাবাদের বৈঠক।

আলাপচারিতা এগোয় খণ্ড খণ্ডভাবে, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কিন্তু প্রত্যেক খণ্ড–মন্তব্য অন্যগুলোর সঙ্গে একটা সংলাপ তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমি পাঠকের উপলব্ধির সুবিধার্থে প্রত্যেকের বক্তব্যের এক–একটা অংশ পেশ করছি এইভাবে :

মনোজ ত্যাগী বলেন, 'উপনিবেশবাদের ঐতিহ্য থেকে এসেছে দল। আজ তা কর্পোরেট পুঁজির সেবা করছে।'

পাঞ্জাবের সুদেব সিং বলেন, 'দল–পরিচালিত–গণতন্ত্র থেকে জনগণ–পরিচালিত–গণতন্ত্রে আসতে হবে'। একটা ছকও তিনি হাজির করেন : প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কে প্রথমে আসবে দৃষ্টিকোণ, তারপর অ্যাজেন্ডা এবং সেই নিরিখে সংগঠন।

নাগপুরের বিলাস সত্তরের দশক থেকে মার্ক্সবাদী ঘরানায় চলে একসময় নিজের ভিতরেই প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। তিনি 'সভ্যতা'–র পূর্বাবস্থার মানব সমাজের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, কার্যকলাপ (activity) এবং শ্রম (labour/work) এক নয়, কার্যকলাপ তো চলবেই।

পরপর বক্তব্যে প্রথম ছেদ পড়ে মন্থনের প্রশ্নে : 'শ্রম থেকে কার্যকলাপে যাওয়ার প্রথম কদমটা কী?' বিলাস জবাব দেন, 'শ্রম হল তা–ই, যা লোকে বাধ্য হয়ে করে'। জব্বলপুরের ভাষাবিদ্যার গবেষণায় যুক্ত রবীন্দ্র বলেন, 'শ্রম তো নিজের ইচ্ছায় হয় না, ব্যবস্থার ইচ্ছায় করতে হয়'। একইসঙ্গে তিনি আরও কয়েকটা কথা এক নিঃশ্বাসে যোগ করে দেন মূল আলোচনার ধারায়, দল একটা ব্যবস্থার অঙ্গ, সেটা আলাদাভাবে উবে যাবে না। জীবন সামগ্রিক, জ্ঞান খণ্ডিত। মার্ক্সবাদ বাইরের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা ভিতরে। বাইরের সঙ্গে ভিতরের সংযোগ ভাষা। ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক জ্ঞানের। যেখানে আমরা আটকে যাই, ভাষার মধ্যে তার সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়। সমাজবাদ পুঁজিবাদের বিকল্প (binary) হিসেবে ঘোষিত হলেও তা পুঁজিবাদেরই অংশ–উপাদান।

এরপর আলোচনা 'ভাষা'–র খাতে কিছুটা বয়ে যায়। কিছুটা তর্কও হয় : ভাষা আমাদের কাঠামোর (structure) দিকে নিয়ে যায়। যে কোন ভাবনাকে কি ভাষা ছাড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব? কেউ কেউ আলোচনার এই অংশটা বুঝতে না পেরে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তখন মধ্যপ্রদেশের প্রান্তিক আদিবাসী গ্রামে দীর্ঘদিন 'গণতান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্র' চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন এক কর্মী জয়শ্রী আলোচনাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনেন এই কথা বলে : 'লোকসমাজ পুরনো। দল এসেছে অনেক পরে। তবে এক–একটা কাজের জন্য মুখিয়া তো লাগেই।'

'এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রয়োজন, ... আমাদের পরিবর্তন করা দরকার' — এভাবে দল–নির্দল তর্কটাতে একটা মাত্রা সংযোজন করতে চান এলাহাবাদের লাল বাহাদুর বর্মা। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে লেনিনবাদী গোষ্ঠী সিএলআই(এমএল) হয়ে নানান অ্যানার্কিস্ট নির্দলীয় সমন্বয় তথা আন্দোলন পর্যন্ত গেছেন। এখন গোটা যাত্রাপথটাকে পর্যালোচনা করে দেখবার চেষ্টা করছেন।

এলাহাবাদেরই আর এক গান্ধীবাদী বর্ষীয়ান কর্মী বিমল বলেন, 'জনআন্দোলন থেকে যে ফল পাওয়া যায়, তা দলকে শক্তিশালী করে না।' এই শহরেরই আর এক কর্মী বিভূতি বলেন, 'দলের প্রতি মোহভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও নির্দলীয়তার ধারণা প্রথমে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্পষ্ট হবে, তারপর জনমানসে'। মধ্যপ্রদেশের কর্মী নীলা হার্ডিকার বলেন, 'দল আরও খারাপ হতে থাকবে, তা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত'।

এরপর আমরিন ও যোগীন তাঁদের পেশ করা দলিলের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। দলিলের শিরোনাম ছিল, 'নির্দলীয়তা/দলীয়তার সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে বন্ধুত্ব, সহমর্মীতা আর প্রতিরোধ–বিদ্রোহের সাগরে মিলিত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে, চলতে হবে'। যোগীন প্রথমেই ক্ষমতার প্রসঙ্গকে আলোচনার মধ্যে যুক্ত করেন। জনতার ভিতর থেকে ক্ষমতা গড়ে ওঠে, তার মধ্যেই থাকে খারাপ হয়ে যাওয়ার জীবানু (ভাইরাস)। ক্ষমতার ভিতর ও বাইরে থেকে সেই ভাইরাসকে দুর্বল করার কাজ করতে হয়। আমাদের সমস্ত সক্রিয়তার মধ্যেই থাকে ক্ষমতার অদৃশ্য ভাইরাস।

আমরিন আরও এগিয়ে বলেন : গোড়া থেকেই রাষ্ট্রের মূর্তি আমাদের ভিতরে রয়েছে। আজকের পুঁজিবাদী সমাজ স্থির নয়, অঘনীভূত তরল। অর্থনৈতিক শোষণই একমাত্র প্রশ্ন নয়। আরও অনেক প্রশ্নে আমাদের লড়াই চলতে থাকে। সংগঠিত আনুষ্ঠানিক সক্রিয়তার বাইরেও সমাজে সক্রিয়তা রয়েছে। আধিপত্য আর প্রতিরোধ সমাজে জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে কাঠামো (structure) হল নোঙ্গর আঁকড়ে ফেলা। মার্ক্সবাদ, নারীবাদ

ইত্যাদির মধ্যে আমরা একটা নিশ্চয়তা খুঁজতে চেয়েছি। কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমরা বাস করি।

এখানে এই বক্তব্যের মধ্যে একটা বাস্তবতাকে যোগীন ও আমরিন একটা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করতে চাইছিলেন। শব্দটা হল 'সিজো' (schizo)। সন্ধ্যাবেলায় আলাপকারীরা যখন ওঁদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলেন, তখনও নানান পরস্পর-বিরোধী ঘটনা ও বিষয়ের ব্যাখ্যা চাইলে ওঁরা 'সিজো' শব্দটা দিয়ে সেই বাস্তবতাকে বোঝাতে চাইছিলেন।

যেটুকু বোঝা যাচ্ছিল, সিজো একটা দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানবমনকে এক কেন্দ্রায়িত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র হিসেবে না দেখে তাকে অজস্র দৃশ্য ও অদৃশ্য ধারা, যা পরস্পর-বিরোধীও হতে পারে, অনেক চলমান সঙ্গম-ক্ষেত্র হিসেবে দেখে।

এত অবধি আলোচনা চলার পর 'নির্দলীয়তা' প্রসঙ্গটা এমন এক স্তরে পৌঁছে যায়, যে অবস্থাটা প্রায় সকলেই নিজের মতো করে বুঝে নিতে চাইছিলেন। কেননা এটা নিশ্চয় যে উপস্থিত প্রত্যেকেই তাঁর কক্ষপথে এক বিশেষ অবস্থার বাস্তবতায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই অবস্থাকে চিহ্নিত করতে এবং পারস্পরিক সংলাপের মধ্যে নিয়ে আসতে প্রায় সকলেই ব্যাকুল।

দ্বিতীয় দিন স্থির ছিল কিছুটা ব্যবহারিক আলোচনার জন্য। সেখানে শিরোনাম হবে 'ক্ষমতা-মুক্তি প্রবাহ'। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে কিছু কার্যক্রমের কথা ভাবা হবে; কিছু লেখাপত্র, যে দলিলগুলো পেশ করা হয়েছে এবং যোগীন ও আমরিনের দলিলটি পুনর্সম্পাদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হবে এবং বিচার-বিমর্ষের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পরবর্তী বৈঠক স্থির হয় রাজস্থানে, দু'বছরের মাথায়।

পাঠকসভার বিবরণ

অমিতা সান্যাল

দীর্ঘদিন পর মন্থন সাময়িকী পত্রিকার এক পাঠকসভা অনুষ্ঠিত হল গত ২৫ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেলে, ঢাকুরিয়ায় সেলিমপুর অঞ্চলে। ইতিমধ্যে বিশেষ কিছু কিছু বিষয়ে মন্থন-এর উদ্যোগে আলোচনাসভা ইত্যাদি হলেও শুধুমাত্র এই পত্রিকার বিষয়ে পাঠকসভা হল অনেকদিন পর। যথেষ্ট খারাপ আবহাওয়া-বৃষ্টি-বাদল সত্ত্বেও মোট ১৭ জন হাজির হয়েছিলেন।

নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৪৫ মিনিট পরে সভা শুরু হয়। পত্রিকার নিয়মিত পাঠক কিন্তু নানা কারণে সভায় হাজির থাকতে পারছেন না, এমন ছ'জনের লিখিত মতামত পড়ে শোনান তমাল ভৌমিক। এঁদের মধ্যে মতিলাল দেবনাথ জানিয়েছেন, ২০১০-এর চীন বিষয়ক সংখ্যা দু'টি (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ও মে-জুন) তাঁর ভালো লেগেছে। তবে 'নিক্সনের চীন সফর এবং সাংহাই ঘোষণাপত্র' লেখাটা খটোমটো লেগেছে। 'উ হানের নাটক নিয়ে নাটক' আরও বড়ো করে লিখলে ভালো হত। জুলাই-আগস্ট সংখ্যার 'বাতিল শ্রমিক' লেখাটি প্রায় উপন্যাস, তাঁর দারুণ লেগেছে।

দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেছেন, বাতিল শ্রমিক লেখাটিতে পুরনো সংগঠনের নেতার নাম দিয়ে ওই সংগঠনকে খাটো করা হয়েছে। এটা তাঁর ভালো ঠেকেনি। কাশ্মীর বিষয়ক লেখাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কাশ্মীরের বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বললে খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, পাথর ছোঁড়ার জন্য বাইরে থেকে পয়সা পাঠানো হচ্ছে। দেখেশুনে মনে হয়, কাশ্মীর সমস্যার আর সমাধান হবে না। 'কী করতে হবে' সে ব্যাপারে মন্থন কোন স্পষ্ট লাইন রাখতে পারছে না, রাখাটা দরকার।

সজল রায়চৌধুরি মনে করেন, মন্থন সাময়িকী লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করছে। মাটির কাছাকাছি মানুষদের ভাষার সমস্যাটাও আলোচনায় আসা উচিত। স্থানীয় মানুষের আপন ভাষাকে কাজে লাগাতে না দিয়ে লোকপ্রজ্ঞাকে ধ্বংস করে একটা একমুখী একছাঁচের সংস্কৃতি বানানোর অপচেষ্টা চলছে, তাদেরকে ইংরেজি জানা মানুষদের অধীনে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

মণিদীপা ভৌমিকের চীন বিষয়ক লেখায় তেমন আগ্রহ নেই। কিন্তু কাশ্মীর ও ফলতা এসইজেড সংক্রান্ত সমস্ত লেখা তিনি আগ্রহভরে পড়েছেন। এবছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ভরত মনসাটার খোলা চিঠি 'বিষগর্ভা' খুব ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে মার্চ-এপ্রিল সংখ্যার 'যুদ্ধের রূপান্তর' এবং জুলাই-আগস্ট সংখ্যার সম্পাদকীয়। সাধারণ পাঠকদের দিকে তাকিয়ে মন্থনে সব ক'টা ভারী ভারী লেখা না দিয়ে দু'একটা সহজ লেখাও দেওয়া উচিত। যেমন, এবারের 'বাতিল শ্রমিক' লেখাটি। তবে "আমরা যারা সাধারণ সংবাদপত্রের বাইরে কিছু পড়ি না, মন্থন পড়ে তারা অনেক নতুন জিনিস জানতে পারি। নাওমি ক্লেইন-এর 'পৃথিবীর গায়ে ফাটল' পড়ে মনে হয়, ওপরতলার লোকেরা জেনেশুনে যে কোন সর্বনাশ করতে পারে, আমরা সেখানে অসহায়।"

চূর্ণী ভৌমিক জানিয়েছেন, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৯ সংখ্যার 'নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র' নিয়ে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত এধরনের আলোচনা থাকলে ভালো হয়। সম্প্রতি খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে, মোবাইলে প্রেমিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ছবি তুলে বেচে দেওয়ার। মোবাইলে সহজে ছবি তুলতে পারার সঙ্গে বেচে দেওয়ার ইচ্ছের একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। এর সঙ্গে জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত সৌরীন ভট্টাচার্যর "উন্নয়ন : দু'একটি প্রশ্ন" লেখায় উল্লিখিত 'প্রয়োজন'-এর প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে কেউ আলোকপাত করলে ভালো হয়। নাওমি ক্লেইনের লেখাটি খুব দরকারি, এটির আরও প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

সৌরীন ভট্টাচার্য মন্থন সম্পর্কে অন্যদের কিছু সমালোচনার কথা আমাদের জানিয়েছেন। হিংসা-অহিংসার প্রসঙ্গে মন্থনে যেভাবে অহিংসার পক্ষে কিছু কথা উঠে এসেছে, তাতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের একটা অংশ এবং কিছু বয়স্ক মানুষ, যাঁরা বিপ্লবী পন্থায় বিশ্বাসী, তাঁদের সমালোচনার মূল কথা হল, 'হিংসা আছে এবং ক্ষমতায় যারা আছে, তাদের বিরুদ্ধে যে হিংসাত্মক পথই গ্রহণ করতে হবে, তাতে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। মন্থন যেভাবে অবস্থান পাল্টাচ্ছে, তা ঠিক নয়।'

উপরোক্ত ছ'জনের বক্তব্য জানার পর সভায় উপস্থিত পাঠকেরা একে একে নিজেদের মতামত জানাতে থাকেন, আবার কখনও কখনও একজনের কথার পৃষ্ঠে সেই বিষয়ে অন্য কেউ বলতে থাকায় কিছু বিষয়ে বিতর্ক হয়, আলাপ-আলোচনা জমে ওঠে। যে যে বিষয় আলোচনায় বেশি উঠে আসে সেগুলি হল : এক, হিংসা-অহিংসার প্রসঙ্গ। দুই, কাশ্মীর সমস্যা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ। তিন, মন্থন পত্রিকার নির্দিষ্ট লাইন না থাকা অর্থাৎ দিশাহীনতার সমস্যা।

মিত্রা চ্যাটার্জি জানান, তাঁর কাছে কথাপ্রসঙ্গে একজন একটা সমালোচনা করেছেন যে মন্থনের মত বা অবস্থান পাল্টাচ্ছে, হিংসা থেকে অহিংসার দিকে। কেন এরকম বলছেন? বিষয়টা আলোচনার দরকার।

বঙ্কিমও এরকম মন্তব্য শুনেছেন যে বিপ্লব তাহলে কী করে হবে? গান্ধীজির নাম তবে নেই কেন? ইত্যাদি। শমীক সরকার বলেন, হিংসা–অহিংসার প্রশ্নটা নিয়ে বেশ সাড়া পড়েছে। এটা নিয়ে বিভ্রান্তিও আছে। সত্তরের দশকের বিপ্লবী হিংসা আমরা অনেকেই দেখিনি। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এর একটা গ্রাহ্যতা আছে। এই কথার মাঝে অঙ্কুর রায়চৌধুরি একটা তর্ক জুড়ে দেন, বিষয়টা হিংসা বনাম অহিংসা নাকি রাজনৈতিক বনাম অরাজনৈতিক? আন্দোলনের কোন পর্বে একটা উত্তরণ ঘটানোর জন্য হিংসাত্মক কোন পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা এক জিনিস, আর আজকে চারিদিকে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটছে তা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক জায়গা থেকে, একটা প্রতিশোধমূলক জায়গা থেকে ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ায় ঘটছে বা ঘটানো হচ্ছে। এই হিংসাকে বর্জন করাই শ্রেয়। শমীক জানান, ঝাড়গ্রামের একজন বন্ধু প্রথমে বলেছিলেন, হিংসা বর্জন করা যাবে না। এখন একটা গ্রামে ঢুকতে না পারায় তাঁর অবস্থান পাল্টে গেছে। আমাদের যেসব বন্ধুরা আজ লালগড়ে হিংসা প্রত্যক্ষ করছে, তাদের অবস্থানও এখন এরকমই, তারাও বিভ্রান্ত। আবার সৌরীন ভট্টাচার্যর লেখায় কার্যত একটা প্রশ্ন উঠেছে যে (মাওবাদীদের) হিংসাকে সমর্থন করা হবে কি না। মন্থনে এই নিয়ে সরাসরি বক্তব্য আসা উচিত। মিত্রা চ্যাটার্জি বলেন, মন্থনের হিংসা বা অহিংসাকে সংজ্ঞায়িত করে দেওয়া উচিত নয়। উত্তরটা মানুষকে আলাদাভাবে ঠিক করতে হবে। এপ্রসঙ্গে পরে অমিতা সান্যালের বক্তব্য ছিল, হিংসা–অহিংসা নিয়ে মন্থনের যে সংখ্যায় চর্চা করা হয়েছিল, সেখানে ভগবতী পাণিগ্রাহীর 'শিকার' গল্পটাও ছিল। মন্থনে নানারকম মতই উঠে আসে। কোন একটা কর্মসূচি ঘোষণা করে দিলেই হয় না। আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিংসা বা অহিংসা দুরকম পদ্ধতিই সময় ও প্রয়োজন বিশেষে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কোনও ছুঁৎমার্গ থাকাটা উচিত নয়।

তমাল ভৌমিক জানান, কোন কোন স্টলে মন্থন–এর বিক্রি কমে গেছে। তবে তাঁর মতে চীন, কাশ্মীর ইত্যাদি বিষয়ে সময়মতো কভার করার চেষ্টা হয়েছে। মিত্রা চ্যাটার্জি জানান যে মন্থন পত্রিকা পড়ে তিনি খুবই সমৃদ্ধ হন। চীনের লেখাগুলিও তাঁর দারুণ লেগেছে। 'পৃথিবীর ফাটল' লেখাটি পড়ে তিনি এতটাই উৎসাহিত হন যে নেট সার্চ করে আরও জানার চেষ্টা করেছেন। অঙ্কুর রায় চৌধুরি বলেন, ইন্টারনেট ইত্যাদি সত্ত্বেও মন্থনে এত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং আলোচনা থাকে যে মন্থন না থাকাটা অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে হয়। এক নকশাল দাদা যখন বলেন যে, 'মন্থনে আছিস? কিন্তু ওদের তো কোন লাইনই নেই', তখন তাঁর মনে হয়, মন্থন বের করাটাই একটা আন্দোলন। মিত্রাও তাঁর সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন। প্রসেনজিৎ রায় বলেন, কাশ্মীর সংখ্যাটা তাঁর ভীষণ ভালো লেগেছে। স্টল থেকে সংগ্রহ করে মাঝেমাঝে মন্থন পড়েন তিনি। সুনীল হাওলাদার ২০০৭ সালে মন্থনের গ্রাহক হয়েছিলেন। নিয়মিত পত্রিকা পেতে তাঁর একটু অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি বলেন, বাজার চলতি মিডিয়া থেকে অন্যরকম ব্যতিক্রমী পত্রিকা পড়ার আগ্রহ তৈরি করেছে মন্থন। পার্থ কয়াল সময়ের অভাবে মন্থনের সব সংখ্যার সব লেখা পড়ে উঠতে পারেন না। তবে চীনের সংখ্যায় প্রকাশিত বর্তমান চীনের অবস্থার বর্ণনার সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল ফলতার এসইজেড অংশের অবস্থাকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। অভি দাস ২০০০ সাল থেকে মন্থন পড়ছেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক লেখাগুলো ঠিক আছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষণগুলো ঠিকঠাক মার্ক্সবাদী পদ্ধতিতে হচ্ছে কিনা জানেন না। মন্থন নানা বিষয়ে তথ্য দেয়, কিন্তু স্পষ্ট লাইন দেয় না, এটাই তার সীমাবদ্ধতা। মন্থন থেকে তথ্য নিয়েই তিনি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নিজে ঠিক করছেন। কাশ্মীর নিয়ে আগের (১৯৯৯ সালে প্রকাশিত এবং জানুয়ারি ২০০০–এ পুনর্মুদ্রিত) সংখ্যাটা তাঁর বেশ ভালো লেগেছিল। এই সংখ্যায় 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'–এর কথাটা থাকা উচিত ছিল। কাশ্মীরি ভাষা কীভাবে তৈরি হল, উর্দু তাদের মূল ভাষা কিনা, নাচ ইত্যাদির পুরনো সংস্কৃতি নিয়ে তাদের বর্তমান পরিবর্তনকে কেউ হিসেবে আনছে না।

জিতেন নন্দী এই প্রসঙ্গে জানান যে, কাশ্মীরি একটা আলাদা ভাষা, উর্দু থেকে আলাদা। পাকিস্তান থেকে অনেক উর্দুভাষী কাশ্মীরে এসেছে। ওখানে উর্দু, কাশ্মীরি এবং ইংরেজিতে (সবচেয়ে বেশি) পত্রিকা আছে। কাশ্মীরি ভাষা আজ প্রায় অবলুপ্ত। ওখানকার পণ্ডিতদের মাধ্যমে কাশ্মীরি ভাষার চর্চা হত। ওদেরকে ভারত সরকার রাতারাতি সরিয়ে দেওয়ার ফলে সেই চর্চাটা কমে গেল। যেমন, মেটিয়াবুরুজে উর্দুর থেকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের চল অনেক বেশি, কাশ্মীরেও এখন তাই। কাশ্মীরে কথ্যভাষা হিসেবে এখনও কাশ্মীরি চালু আছে।

শমীক সরকারের কাছ থেকে জানা গেল, কোচবিহারের গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই কাশ্মীর নিয়ে লেখাগুলো গ্রহণ করেছে। চীন নিয়ে লেখায় তাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। একজন বলেছেন, সৌরীনবাবুর উন্নয়ন নিয়ে লেখা ফোকাস থেকে সরে গেছে। ওখান থেকে প্রস্তাব এসেছে, মন্থনে কাশ্মীরের ইতিহাস দেওয়া হোক। এই প্রসঙ্গে অঙ্কুর প্রস্তাব দিলেন, কাশ্মীর নিয়ে আলাদা করে বই হোক।

শমীকের আরও সংযোজন, জলপাইগুড়ি থেকে জানিয়েছে মন্থনের লেখাগুলো খুব বড়ো হয়। নাগপুরের এক বন্ধু 'যুদ্ধের রূপান্তর' লেখাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। মূলত সমীক্ষামূলক লেখা সবাই পছন্দ করে।

সভায় উপস্থিত বর্ষীয়ান পাঠক অনিন্দ্য দত্ত বলেন, সংবাদমন্থন আর মন্থন সাময়িকীর ওপর যদি আলাদা কাজের ভার দেওয়া যায়, যেমন সাম্প্রতিক খবর সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ করা হল সংবাদমন্থনে, আর মন্থন সাময়িকী মূলত সমীক্ষামূলক লেখা ছাপাক। মন্থনের কাজ রাজনৈতিক লাইন দেওয়া নয়, কিন্তু কিছু কিছু রাজনৈতিক বিষয় তো আছে যার চর্চা দরকার। যেমন ইউএসএ–র বৈদেশিক নীতি — একটা দেশকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা; কাশ্মীরের আজাদি মানে তো পাকিস্তানের খপ্পরে পড়া, তাহলে আত্মনিয়ন্ত্রণের মানে কী? এখন তো দেখা যাচ্ছে, তার মানে স্থানীয় মাফিয়াদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া; চীন বিপ্লবের পর কোথায় গেল? ভিয়েতনাম কী করল? সবারই তো নীতি ছিল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এ বিষয়ে রোজা লুক্সেমবুর্গ লেনিনকে কী বলেছিলেন? ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা জানি, হিংসা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের দরকার পার্টিসিপেটরি প্রসেস (অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া)। গ্রামশি বলেছেন, সাধারণ মানুষ অনুভব করে, কিন্তু জানে না; আর জ্ঞানী জানে, কিন্তু অনুভব করে না। তাই পার্টিসিপেটরি প্রসেস গোড়া থেকে করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যত সমাজ গড়ার দিকে তাকিয়ে গোড়া থেকে কাজ করা দরকার। আজকে কাশ্মীরে এমন হল কেন? কাশ্মীরি ভাষা অবলুপ্ত হতে চলেছে কেন? বাংলাদেশে তো তা হয়নি। সেখানে বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা, গবেষণা পর্যন্ত হয়। বিদেশে দেখেছি, তাইওয়ানের ছেলে চীনাভাষায় স্ট্যাটিস্টিকসের বই দেখছে।

সৈকত সেনগুপ্ত একটু দীর্ঘ রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন। মন্থন কম পড়তে পারায় তাঁর কথাগুলো পাঠকবৃত্তকে ছুঁয়ে যায়নি। পার্টিসিপেটরি প্রসেস বিষয়ে অনিন্দ্য দত্ত যে আলোচনাটা শুরু করেন, সে সম্পর্কে সভায় কয়েকজন নিজের নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করেন। যেমন, মিত্রা চ্যাটার্জি মাওবাদীদের সম্পর্কে বলেন, ওরা প্রথমদিকে যেসব কাজ করত, তাতে ওরা মানুষের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে আর তা থাকল

না। ... এ নিয়ে আরও কথা উঠলেও আলোচনা অন্য বিষয়ের দিকে গড়িয়ে গেল। অনিন্দ্য দত্তের ভাবনাটা পরে কোনসময়ে বিশদে আলোচনা দরকার। উন্নয়ন সম্পর্কে ওঁর ভাবনাটা 'বারোমাস' পত্রিকায় তিনি বলার চেষ্টা করেছেন বলে জানা গেল।

রঘু জানা বলেন, কোন কিছু নির্দিষ্ট করা মানেই অ্যাকশনের লাইন নেওয়া, বামপন্থী রাজনীতিতে সেটাই আমরা শিখে এসেছি। র‍্যাডিকাল গোষ্ঠীগুলো ত্রিশ বছর ধরে একই কথা বলে চলেছে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না। নতুন করে ভাবা দরকার। তিনি মন্থনে আগ্রহী, কারণ একটা চিন্তার চর্চা চালাতে পারছেন এবং তাতেই বেঁচে আছেন। সৌরীনবাবুর লেখা ধরা যায় না, তা খানিকটা ঠিক। কিন্তু আমাদের চিন্তার কাঠামোর জন্যও আমরা ওঁর ভাবনাকে ধরতে পারি না। হিংসা-অহিংসা নিয়ে আমরা নিছক গল্প করিনি। মন্থন পত্রিকার উদ্যোগে 'যুদ্ধ বন্ধ করো' আবেদন নিয়ে মানুষের কাছে গেছি, উল্টোডাঙার বস্তিতে ঘুরে ঘুরে সই সংগ্রহ করে সেই আবেদনপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছি। এই দাবিতে আমরা অনশনও করেছি। লালগড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে স্বামী অগ্নিবেশের কাছে ই-মেল পাঠিয়েই আমাদের কাজটা ভণ্ডুল হয়ে গেল। বড়ো করে কর্মসূচি নেওয়ার প্রবণতাই সব নষ্টের মূল। অনেক সময় ছোটো ছোটো কথা আমাদের অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, কারণ মন চায় নির্দিষ্ট কর্মসূচি ও অ্যাকশন। কিন্তু সমগ্রটা বুঝতে হলে ছোটো ছোটো জিনিসগুলোও দৃষ্টির মধ্যে আনতে হয়।

সভার শেষে পত্রিকার সম্পাদক বলেন, অনেক বিষয়ের মাঝে তিনটি বিষয় আজকের সভায় গুরুত্ব পেয়েছে : হিংসা-অহিংসা, লাইনের স্পষ্টতা এবং কাশ্মীর। কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি আমরা উচ্চারণ করেছি কিনা, এ প্রশ্ন উঠেছে। ১৯৯৯ সালে যখন কাশ্মীর নিয়ে পত্রিকার সংখ্যা হল, তখন এ নিয়ে বিভিন্ন লেখকেরা স্পষ্ট আকারেই বলেছিলেন। এবার যখন কাশ্মীর বিষয় হচ্ছে, তখন আমরা কাশ্মীরিদের লেখাগুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছি — বেদ ভাসিনের সাক্ষাৎকার, আফসানা ভাট এবং অন্যদের লেখায় তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মুক্তির বিষয় নিয়ে বলছেন। যার কথা সে-ই বলুক, এটাই তো আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা ধাপ। এটাই তো তার নিজের ব্যাপারে নিজের অংশগ্রহণ বা পার্টিসিপেশন। এটা বিভিন্ন ইস্যুতেই আসে। যেমন, আমাকে বলতে হবে তুমি তৃণমূলকে ভোট দাও বা সিপিএমকে ভোট দাও, লেনিন বললেন রাশিয়ার শ্রমিকের মুক্তির কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা একটা ভদ্রলোকী রাজনীতি বা এলিটিজমের ঝোঁক। আমরা বুঝি, আমরা অভিভাবক, — এটা কাটানো দরকার।

চিঠিপত্র

১. বিষয় : হিংসা-অহিংসার তর্ক

মহাশয়,

অতি সম্প্রতি রাজনৈতিক দলের কর্মী ও রাজনৈতিক দল বহির্ভূত রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকটে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে 'হিংসার ব্যবহার' নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তথাকথিত মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সদিচ্ছা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আমার আছে। তবে গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনীতিতে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের 'হিংসা' সম্পর্কে মত আদান প্রদানকে অবশ্যই সম্মান জানাই। অবশ্য তাদের অনেক বক্তব্যে আমি খানিকটা বিভ্রান্ত, দিশাহীনও বটে। তাই এই প্রেক্ষিতে আমার কিছু নিজস্ব ভাবনা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কোনও ভনিতা না করেই বলা যায়, সম্প্রতি মাওবাদীদের ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। যদি পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদী সংগঠিত হত্যা এবং মূল স্রোতের রাজনৈতিক দল কর্তৃক হত্যার তুলনা করা যায়, তবে দেখব দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক হত্যার সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। পাশাপাশি এটাও সত্য যে মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলির হত্যালীলাতে কোনও বিরাম নেই। অবশ্য সেটা অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, মাওবাদীদের দ্বারা হত্যাও গা-সওয়া হওয়া দরকার। সেটা মোটেই কাম্য নয়। তাদের এই হত্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু অপ্রয়োজনীয় — অর্থহীনই নয়, ভয়ঙ্করও বটে। এই ধরনের হত্যা থেকে শ্রেণীশত্রু সম্পর্কে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। মনে হয় মাওবাদীদের শ্রেণীশত্রু তাহলে না খেতে পাওয়া প্রান্তিক মানুষগুলো, অবশ্য তাদের লড়াই নাকি ওই প্রান্তিক মানুষগুলোর জন্য। জানি না এই স্ববিরোধের কী কারণ। হয়ত একটু প্রসঙ্গচ্যুত হলাম। আলোচনার শুরুতেই বলতে চাইছি, মূলস্রোতের রাজনৈতিক দল কর্তৃক হত্যা এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে পারেনি। অথচ এটাই প্রত্যাশিত ছিল। এখানেই আমাদের নিরপেক্ষতা সামান্য হলেও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, নাহলে আলোচনার দিক সম্পর্কে ভ্রান্তি বাড়তে পারে। আমার ধারণা মাওবাদীরা যদি জঙ্গলমহলে নাও থাকত, তবুও আদিবাসীরা ভারত সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে অহিংস পথে গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই করতে সক্ষম হত না। বাস্তব পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করছে অস্ত্র ধরতে (অন্তত পক্ষে তীর ধনুক)। অধিকার রক্ষার আন্দোলনে এটাই বাস্তবতা, মাওবাদীরা সেখানে থাকুক বা না থাকুক। আলোচনার এই অভিমুখটা যেন মাওবাদী হিংসার সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি। অনেক বিষয়ে আমরা সবাই সহমত পোষণ না করলেও অন্তত একটা বিষয় আজ স্পষ্ট, সেটি হল, জল, জঙ্গল, জমি, পাহাড় এসমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য মাওবাদ দমনের আড়ালে বা মাওবাদকে উপলক্ষ্য করে আদিবাসী-মূলবাসীদেরকে উচ্ছেদ করার চক্রান্তে ভারত রাষ্ট্র এত বেশি কেন হিংস্র হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে যে কোনও গণআন্দোলনকে দমন করার এক হীন প্রয়াসও রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। এরকম গণতন্ত্রহীনতার বিরুদ্ধে এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ঠিক এইরকম একটা মুহূর্তে আপনারা (আপনাদের পত্রিকা সহ বহু সংগঠন, পত্রিকা, ব্যক্তি) ঘোষণা করছেন, 'আমরা হিংসার বিরুদ্ধে'। 'আমরা হিংসার বিরুদ্ধে' — এই বক্তব্যটি রাষ্ট্রকে হিংসার পথ থেকে সরাতে পারে কি? অবশ্যই পারে না। অন্য দিকে প্রতিরোধে সামিল মানুষের প্রতিরোধ থেকে সরে আসার সম্ভাবনা প্রবল হয় প্রতিরোধ হিংসার পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার আশঙ্কায়। এতে প্রতিরোধে শামিল মানুষের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। যার ফলে প্রতিরোধ হয় দুর্বল। অর্থাৎ আপনাদের এই বার্তা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রশক্তিকেই শক্তি যোগায়।

আপনারা একটি লিফলেটে ঘোষণা করেছেন, 'প্রতিরোধ আন্দোলনের যুক্তিতে কোনওরকম সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের আমরা পক্ষপাতি নই।' এ প্রসঙ্গে প্রথমেই জানা দরকার, মানুষ কখন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে থাকা মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে না। যখন জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হয় অথবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তখনই প্রতিরোধের প্রশ্ন আসে। যখন তার প্রত্যাশাভিত্তিক মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয় তখনই আসে প্রতিরোধের প্রশ্ন। যখন প্রতিরোধের ওপর মানুষের বাঁচা মরা নির্ভর করে তখন প্রতিরোধ তাকে করতেই হয়। প্রতিরোধের দুটি পক্ষ থাকে। প্রতিটি পক্ষই ভাবে তার কাজ ন্যায্য অথবা ন্যায্যতা আছে এমন ভান করে। যখন একজন মানুষ অন্যজনকে হত্যার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয়

মানুষটির বাঁচার জন্য প্রত্যাঘাত করার অধিকার আছে — এটা আমরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করি। আমাদের বিভ্রান্তির কেন্দ্রবিন্দু বোধহয় অন্য জায়গায়। কোন সংগঠিত শক্তি যখন অন্যের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেয় তখন নিপীড়িত মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব। আপনারা ঘোষণা করেছেন, আপনারা হিংসাত্মক কার্যকলাপের পক্ষপাতী নন। কিন্তু আপনারা অন্য কোনও উপায় বলেননি যেভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। নিপীড়নকারী যখন হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালাচ্ছে তখন নিপীড়িতদের কর্তব্য কী হবে? অনেকে রক্তখেকো মশার কথা উল্লেখ করবেন — হয়ত বলবেন — মশা আর কতটা রক্ত খাবে? একসময় নিজেই ক্লান্ত হয়ে রক্তচোষা থেকে বিরত হবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, একটি মশা যতটুকু রক্ত খায় তাতে আমাদের অস্তিত্ব কখনই বিপন্ন হয় না। কিন্তু মশার সংখ্যাটা যদি একের পরিবর্তে হাজার হাজার হয় — তখনও কি একই কথা বলবেন? হাজার হাজার মশার দ্বারা আক্রান্ত হলে হয়ত পরামর্শ দেবেন দৌড় দিতে অথবা পালাতে। ঠিক আছে, দৌড়লাম। কতটা দৌড়ব? এবার যদি মশারা তাড়া করে তাহলে কী করব? প্রথমে হয়ত নিরাপদ জায়গা খুঁজব, কিন্তু যখন পাব না তখন কী করব? একসময় আমাকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। অর্থাৎ প্রতিরোধ (counter act) গড়ে তুলতেই হবে, দরকার হলে প্রতি আক্রমণ করতে হবে (counter attack). তখন যদি কেউ আমাকে উপদেশ দেয় — 'মহাশয়, আপনি কিন্তু হিংসার আশ্রয় নিচ্ছেন!' তখন আমি অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিআক্রমণের সীমারেখার তত্ত্বে নিয়োজিত থাকব না হিংসা মাপার কোনও একক দণ্ড নিয়ে কোথায় কতটুকু হিংসা হল তা পরিমাপ করব? এ দুটোর কোনটাই আক্রান্ত ব্যক্তি করবেন না। দরকার মতো তিনি প্রতিরোধ, দরকার মতো প্রতিআক্রমণ করবেন। কারণ তাঁকে বাঁচতেই হবে।

যখন একপক্ষ আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমস্ত অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তখন দ্বিতীয় পক্ষ অহিংসার মন্ত্র জপে অধিকার রক্ষা করতে পারবে কি? পৃথিবীর ইতিহাসে কি কখনও সম্ভব হয়েছে (যদিও নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের বিষয়টিকে উড়িয়ে দিচ্ছি না)? শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিরোধ করে মানুষের অধিকার কি রক্ষা করা গেছে? এভাবে হিটলারদের কখনও আটকানো গেছে কী? যতদূর জানি, প্রতিআক্রমণে তাদের শক্তি যতদিন না দুর্বল হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত কোনও শান্তি চুক্তিতে তাঁরা আবদ্ধ হননি বা অধিকার আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেননি। আর যদি বলেন হৃদয় পরিবর্তনের কথা তবে বলি, হৃদয় পরিবর্তন কোনও একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির হতে পারে (যদিও গান্ধীজীর দীর্ঘজীবনের অহিংসা অনুশীলন ব্রিটিশদের হৃদয় পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি) কিন্তু কোনও সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যেমন, পুঁজিতন্ত্র) যা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ক্ষেত্রে হয় না। কারণ রাষ্ট্রের তো হৃদয় নেই। আপনারা আপনাদের বক্তব্যে সার্বিকভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেছেন। সত্যিকারের হিংসামুক্ত সমাজ অবশ্যই কাম্য। আমি নিজেও তা চাই। তবে আমার 'চাওয়া'র ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ায় যদি সমাজের বড়ো অংশের ক্ষতি হয় তবে সেই 'চাওয়া' অবশ্যই পুনর্বিবেচনাযোগ্য। প্রতিরোধে অহিংসা আদৌ কোনও উপায় নয় তা বলতে চাইছি না। তবে অবশ্যই সেটা হবে একটা স্তর পর্যন্ত। সেটা নির্ভর করবে অপর পক্ষের আচরণের ওপরও। প্রতিরোধ যেহেতু সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে, তাই হিংসাত্মক কার্যকলাপও সংগঠিত হতে বাধ্য। সেদিক থেকে আপনাদের ব্যঞ্জিত 'কোনরকম'; শব্দটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অন্য কোনও বিকল্প পন্থাকে নস্যাৎ করে যা প্রকৃতপক্ষে সুবিধাভোগী শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে।

যারা আজ হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করছে, তারা কেউই 'হিংসাত্মক কার্যকলাপ'–এ যুক্ত মানুষের লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ সঙ্গী নয়। এটা কিন্তু জানা দরকার — এই লড়াকু মানুষগুলোর সামনে হয়ত সত্যি আর কোনও বিকল্প নেই, যেমন বিকল্প ছিল না 'শিকার' গল্পে ঘিনুয়ার কাছে। তাই তাকে গোবিন্দ সরদারকে হত্যা করতেই হয়েছিল।

হিংসা যেমন কারও ঘোষিত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, তেমনি অহিংসাও কারও ঘোষিত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী সহিংস ও অহিংস পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। যারা একসময় সশস্ত্র বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাস করেছে, তাদের হঠাৎ একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরে অহিংসায় বিশ্বাস — এই পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত। এর দ্বারা বোঝায় তাদের আবেগের আতিশয্যই ছিল, পাশাপাশি ছিল যুক্তিবোধের অভাব। আমিষ ও নিরামিষ দু'রকম খাদ্যেরই প্রয়োজন আছে শরীর সুস্থ রাখার জন্য। কোনও কোনও মিলিট্যান্ট সংগঠনের কর্মীরা সত্যাগ্রহে সামিল হচ্ছেন। সম্প্রতি মিলিট্যান্ট প্যালেস্তানীয় নেতারা বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে রাজ্যের সীমানা ঘোষণা করেছেন। এটা যদি আপনাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয় তবে বলব, এক্ষেত্রেও আবেগের প্রাবল্য বড়ো বেশি। আমরা পূর্বেও দেখেছি, ইজরায়েল রাষ্ট্র কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, যারা একজন মহিলা সাংবাদিককে বুলডোজারে পিষে দিতে পারে, তাদের পক্ষে বৃক্ষচ্ছেদন বা উৎপাটন কি খুব শক্ত কাজ হবে? মনে রাখা দরকার কৌশলগত কারণে আপাত নিরীহ কিছু প্রোগ্রাম নেওয়া যেতেই পারে তবে তত্ত্বগতভাবে হিংসার কার্যকারিতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে গণ আন্দোলনের আত্মহননের পথ প্রস্তুতের সম্ভাবনা প্রবল।

প্রসঙ্গত বলব, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধকে এক করে দেখা উচিত নয়। প্রতিরোধে দায়িত্ববোধ থাকে নিজের প্রতি, একইসঙ্গে অন্যের প্রতিও। অবশ্যই নিজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে অনেক বেশি। প্রতিশোধে যে হিংসা থাকে তাতে কোনও দায়বদ্ধতা থাকে না। থাকে শুধুমাত্র অন্যকে নিকেশ করার বা কষ্ট দেওয়ার আধিপত্যবাদী মনোভাব। অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে প্রতিশোধস্পৃহা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর হিংসা মূলত প্রতিশোধস্পৃহা জাত, নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই।

প্রতিরোধের মধ্যে 'প্রতিআক্রমণ' একটি স্বাভাবিক উপাদান হিসেবে থাকতেই পারে। প্রতিরোধ মানে কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া নয় বা অন্যকে নিকেশ করাও নয়, বরঞ্চ অন্যের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো। তবে এক্ষেত্রে একটা বাস্তব সমস্যা থাকে। নিজেকে বাঁচানোর সেই প্রক্রিয়া যদি হয় শুধুমাত্র অন্যের আঘাতকে প্রতিহত করা তবে তা বেশিক্ষণ সম্ভব নাও হতে পারে, যদি প্রতিপক্ষ আক্রমণ জারি রাখে। ঠিক এখানেই তৈরি হয় প্রতিআক্রমণের বাস্তব পরিবেশ।

যারা তত্ত্বগতভাবেই হিংসার কার্যকারিতাকে অস্বীকার করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, 'অহিংসার মাধ্যমে গণআন্দোলন বা অধিকার রক্ষার আন্দোলনে বড়ো কোনও সাফল্যের উদাহরণ আছে? (সাফল্যের অতীত উদাহরণ থাকতেই হবে এমন মন্তব্যও করছি না)। শর্মিলা ইরম দশবছরেরও অধিক সময় অনশনে থেকে রাষ্ট্রের অবস্থান পাল্টাতে পেরেছেন কি? নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী বাস্তুচ্যুত মানুষের দাবি কতটা আদায় করতে পেরেছেন? ভূপালের গ্যাসপীড়িত মানুষ দিল্লিতে শান্তিপূর্ণ ধর্না দিয়ে ইউসিআইএল–এর কাছ থেকে কতটা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারল? হাজার হাজার মানুষের শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও প্রতিবাদ কুখ্যাত অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে পারল না। কারণ অ্যান্ডারসন এখানে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন, তিনি বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একজন ধারক ও বাহক।

মনে রাখতে হবে, অহিংসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। বারদৌলি সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বারদৌলির কৃষকদের ন্যূনতম দাবিও তিনি আদায় করতে পারেননি। এমনকী

সার্বিকভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেনি তাঁর অহিংস বাণী। সেজন্যই হয়ত ব্রিটিশরা গান্ধীজীকে পরম বন্ধু বলে মনে করতেন। অথচ ব্রিটিশদের চোখে শত্রু ছিলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, মাস্টারদা সূর্য সেন, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীরা যারা সেদিন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁর পূর্বের অবস্থান ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় বলে চিহ্নিত সিপাহী বিদ্রোহ, হুল বিদ্রোহ আদৌ অহিংসার পথে সংগঠিত হয়নি। গণআন্দোলনে নতুন আলোকস্তম্ভ নন্দীগ্রামের সংগ্রাম প্রথমদিকে অহিংস হলেও শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল শাসকদলের সশস্ত্র হিংসার বিরুদ্ধে।

অপরপক্ষে সমস্ত পৃথিবীকে আলোড়িত করেছিল যে রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ কোনটাই অহিংস আন্দোলন ছিল না।

মন্থন সাময়িকী (মার্চ এপ্রিল ২০১০) পত্রিকায় এক চিঠির উত্তরে আপনারা যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রযন্ত্রের অত্যন্ত আধুনিক ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে। এরকম পরিস্থিতিতে আবারও পরামর্শ দিয়েছেন পাল্টা হিংসাত্মক কার্যকলাপ না চালাতে। এটা সত্য যে মূলবাসী আদিবাসীদের প্রতিরোধ অতি নগণ্য রাষ্ট্রের শক্তির তুলনায়। প্রতিরোধের পরিণাম এরা জানে না, তা কিন্তু নয়। আসলে লড়াইটা শুধুমাত্র বাস্তুচ্যুত হওয়ার ভয়েই নয়, শুধুমাত্র আর্থিক সুবিধা পাওয়ার লড়াই নয়, লড়াইটা আত্মমর্যাদা রক্ষারও প্রয়াস। যখন স্বঘোষিত মূলস্রোতবাসীরা জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষি করে, তখন মূলবাসী প্রান্তিক মানুষের কাছে আয়ুভিত্তিক জীবনের স্বপ্ন তুচ্ছ হয় ওঠে। একজন মানুষ যখন ন্যূনতম মর্যাদা পায় না, তখন হিংসা প্রয়োগ হতে পারে তার রক্ষাকবচ।

বঞ্চিত মানুষের কাছে লড়াইয়ের মাধ্যমে মৃত্যু শ্রেয় মনে হতে পারে। তার হৃত মর্যাদা উদ্ধার করার জন্য বা দাসত্বের বন্ধন থেকে চিরকালের মতো মুক্তির জন্য।

২ নভেম্বর ২০১০

শুভেচ্ছাসহ
অমলেন্দু সরকার
সুভাষগ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

২. বিষয় : বাতিল শ্রমিক

'মন্থন'–এ অমিতা সান্যালের 'বাতিল শ্রমিক' লেখাটা পড়লাম খুব ভালো লেগেছে। এর আগে আর একটা লেখা বেরিয়েছিল, তমাল ভৌমিকের। নাম সম্ভবত, 'বুলুর বারোমাস্যা'। একটি গ্রামের মেয়ের প্রতিদিনের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি; ছোটো স্বপ্ন, ছোটো আশার কথা তমাল লিখেছিলেন। বিনা উচ্ছ্বাসে, নিরাভরণ গদ্যে। সত্যের একটা নিজস্ব শ্রী আছে। সত্যতা প্রমাণের জন্য তাকে বানানো গয়না পরতে হয় না। তমাল ও অমিতার লেখায় এই শ্রী আছে। এই সাংবাদিকতাকে যদি কোনও বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করতে হয়, তবে তার নাম হবে সত্যশ্রী ঘরানার সাংবাদিকতা।

এধরনের লেখার আর একটা তাৎপর্য আছে। খেটেখাওয়া মানুষকে যখন গুচ্ছবদ্ধ আকারে দেখি তখন তাঁদের ঐতিহাসিক রূপটা চোখে পড়ে। সেটা গুচ্ছের শ্রেণীপরিচয়। এই পরিচয় বিমূর্ত। অনেকটাই তাত্ত্বিক সংশ্লেষণ। জীবন্ত ব্যক্তি মানুষের মুখচ্ছবি সেখানে পাওয়া যায় না। পাওয়ার কথাও নয়। শ্রেণীচরিত্রের অবিকল প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। ব্যক্তি অনেক বিচিত্র, জটিল। তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, চারপাশের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিক্রিয়ার ধরন একান্তই নিজস্ব। খেটে খাওয়া মানুষের এই ব্যক্তিস্বরূপ, জীবনযাপন, কর্ম ও অনুভবের খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। 'মন্থন'–এর লেখকরা মাঝে মাঝে খেটেখাওয়া এক একজন মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরে ব্যক্তি শ্রমিকের সত্য পরিচয় বুঝতে সাহায্য করছে।

বাতিল শ্রমিক চ্যাটার্জিদারা প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনেই ঘুরে বেড়ান। কখনও তাদের সঙ্গে দেখা হয় ট্রাইবুনালের নিষ্ফল বারান্দায়, কখনও উদাসীন শ্রমিকনেতার দরজায়, কখনও সিকিউরিটি গার্ডের পোশাকে, কখনও ছেলের স্কুলের দরজায়, কখনও ক্রাচে ভর করা এক ভাঙাচোরা এলেবেলে মানুষ হিসেবে। আমরা তাকাই কিন্তু দেখি না। দেখলেই কি বোঝা সম্ভব হত, এই 'তুচ্ছ' লোকটা আসলে এক হার না মানা, অসাধারণ শ্রমিক? যদি না অমিতা চ্যাটার্জিদার জীবনের টুকরো টুকরো ছবি জুড়ে আমাদের সামনে এক জীবন্ত মানুষকে তুলে আনতেন। চ্যাটার্জিদা ট্রাজেডির নায়ক। এক অসম যুদ্ধে যে 'ভূপতিত কিন্তু অপরাজিত'।

কিন্তু লেখাটি সম্বন্ধে একটা কথা না বললেই নয়। এটা যদি সত্য ঘটনা না হয়ে কোনও উপন্যাস হত তাহলে বলতাম লেখক চ্যাটার্জি গিন্নির প্রতি সুবিচার করতে পারেননি; চ্যাটার্জির মহিমা সঠিক ভাবেই চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু সেজন্য চ্যাটার্জি গিন্নিকে খলনায়িকা বানানোর কোনও দরকার ছিল না। স্বামীর ওপর তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের প্রসঙ্গগুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে অমিতার লেখায়। চ্যাটার্জি গিন্নি সম্বন্ধে যতটুকু অমিতা লিখেছেন তা চ্যাটার্জিদার কাছে থেকে পরোক্ষে শোনা। অন্তত লেখাটির মধ্যে ওই মহিলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংলাপের কথা অমিতা লেখেননি।

চ্যাটার্জিদার স্ত্রীর দিক থেকে বিষয়টা দেখা যাক। যতটুকু তথ্য তাঁর সম্বন্ধে দেওয়া হয়েছে সেই টুকরোগুলো জুড়লে পুরো ছবিটা আসে না। সমাজবাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভাব্য কিছু অনুমান ফাঁকটা ভরাতে পারে।

চ্যাটার্জিদার স্ত্রী পিতৃহীন হয়ে কাকার বাড়িতে মানুষ হন। জীবনের বিভিন্নপর্বে বাপের বাড়ির অনুগ্রহ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে। দাদাদের দেওয়া জমিতে একটুকরো ঘর বানিয়েছেন। ছাঁটাই শ্রমিকের স্ত্রী হিসেবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে তাঁর লড়াই তো কঠিন ছিলই। অন্যের অনুগ্রহ নেওয়া মানে কী কী জ্বালা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তার খবর আমরা জানি না। অনুমান করতে কষ্ট হয় না। মাধ্যমিক পাশ মেয়েটির বিয়ে ঠিক হল চার ক্লাস পড়া ওয়েলডারের সঙ্গে। [কথাটা মেয়েটির সম্ভাব্য চিন্তার দিক থেকে বলা হল।] এতে কাকাদের গলগ্রহ মেয়েটির আপত্তি জানানোর সুযোগ ছিল কি? সে বীরজায়া হতে পারেনি। হয়েছে দরিদ্র পরিবারের দুটি শিশুর মা। খড়কুটো ধরে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাকে অভাবের নদী পেরোতে হয়েছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাকে তিক্ত, বীতশ্রদ্ধ করেছে স্বামীর ওপর।

চ্যাটার্জিদার সংগ্রাম সত্য। স্ত্রীর সংগ্রামটা কি সবটাই অনুমান? আসলে, সত্য নানা স্বরে কথা বলে। বিপরীত স্বরেও। অনেক সময় দুই বিপরীতে সত্যতা স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও সত্যশ্রী সাংবাদিককে বলতেই হবে —

সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনও করে না বঞ্চনা।

১৪ নভেম্বর ২০১০

সজল রায় চৌধুরী
বাগমারি, কলকাতা

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com, দূরভাষ : 2491-3666